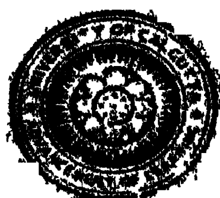
[illegible] চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিগ্রন্থমালা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

মোহিতলাল মজুমদার



[illegible]

১৩৫৫

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিবক্তৃতা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

মোহিতলাল মজুমদার





কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৫৫

মূল্য—২॥৹

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1786B—6th January, 1955

সূচী

ভূমিকা

সমালোচকপ্রবর স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র বক্তৃতামালা পাঠ করিতেছিলেন, তখন সেই বক্তৃতাপাঠের অনেকগুলি অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। ঐ বক্তৃতাগুলি যে একটি অনন্যসাধারণ গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। শত শত উৎসুক শ্রোতা গভীর আগ্রহ ও প্রত্যাশা লইয়া বক্তার মুখনিঃসৃত উক্তিপরম্পরা রুদ্ধনিশ্বাসে শ্রবণ করিতেছিলেন। উচ্চ মঞ্চে আসীন বক্তা যখন তাঁহার রোগজীর্ণ দেহ লইয়া তাঁহার উদাত্ত-গম্ভীর কণ্ঠে ও ছন্দোময় উচ্চারণভঙ্গীতে অপূর্ব ধীশক্তির সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যরহস্য বিশ্লেষণ করিতেছিলেন, তখন সমস্ত প্রতিবেশটি যেন একটি অনির্বচনীয় বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছিল। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আহুতি দিবার সময় যজ্ঞস্থলী যেমন একটি দিব্য আবির্ভাবের প্রত্যাশায় স্তব্ধ উন্মুখ হইয়া থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকণ্ঠমুখরিত, বাদানুবাদবিধূনিত সাধারণ সভাকক্ষ তেমনি নীরব গাম্ভীর্যমণ্ডিত হইয়া এক অসাধারণ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হইয়াছিল। তদুপরি মোহিতলালের অনুচ্চারিত ভাব-ভঙ্গীতে ও লিখিত ভাষার স্থানে স্থানে এই বিষাদজনক সত্যটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল যে বক্তৃতাটি বাগ্‌দেবীর চরণতলে তাঁহার অন্তিম অর্ঘ্য নিবেদন। এই বক্তৃতাগুলি যে কেবলমাত্র সাধারণ সাহিত্যালোচনার পর্যায়ভুক্ত নহে, ইহাদের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় ও গভীর জীবনাকূতিপূর্ণ কবি-সত্তার রুদ্ধ আক্ষেপ ও আপাতব্যর্থতার নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ করুণস্বর ধ্বনিত হইতেছিল, তাহা প্রত্যেক শ্রোতার অন্তরদ্বারে আঘাত হানিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার ব্যাখ্যাতার নিবিড় একাত্মতা এতই সংশয়হীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যোগ্য মর্যাদা অর্পণের মধ্যে তিনি এত গুরুতর জাতীয় তাৎপর্য

আরোপ করিয়াছিলেন, বঙ্কিমের অস্বীকৃতিতে তিনি বাঙ্গালীর স্বধর্মচ্যুতি ও আত্মবিলুপ্তির এরূপ ভয়াবহ সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, মোহিতলালের এই বঙ্কিমপ্রসঙ্গ আলোচনা যেন প্রাচীন ইহুদি ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বক্তা আইজাইয়া ও জেরেমাইয়ার (Isaiah and Jeremiah) বিদ্যুদগ্নিগর্ভ অভিসম্পাত-বাণীর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। ইহা যেন জাতির মোহাচ্ছন্ন আত্মসংবিদ্‌কে পুনর্জাগরিত করার জন্য মোহিতলালের শেষ প্রচেষ্টা। সৌন্দর্যরসিক সমালোচক যেরূপ ফিকে ও গাঢ় নানা রঙের কালিতে তুলি ডুবাইয়া এক বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত করেন, মোহিতলাল তাহার পরিবর্তে, বর্ণবৈচিত্র্যের লীলাবিলাস বর্জন করিয়া নিজ হৃদয়ক্ষরিত শোণিতাক্ষরে বিপদ-সঙ্কেত-সূচক একটি অবিমিশ্র রক্তলিপিতে তাঁহার কাব্যপাঠপ্রসূত মানস উৎকণ্ঠাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

মোহিতলাল যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্কিম-সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন ও উহার উপর যে মৌলিক অনুভূতির আলোকপাত করিয়াছেন, তাহা আমার সদ্যঃ-প্রদত্ত শরৎ-বক্তৃতামালায় সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে ও এই আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কাজেই এই ভূমিকাতে এ সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া হইল না। কৌতূহলী পাঠক সেই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মোহিতলালের রসাস্বাদনের মৌলিকতা ও বিচারের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিতে পারিবেন।

এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, মোহিতলাল শুধু বঙ্কিমের উপন্যাসের কাব্যমূল্য বিচার করেন নাই, তাঁহার কাব্যপ্রেরণা ও মনোগত অভিপ্রায়ের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন; বঙ্কিমের নিজের সাহিত্যালোচনার একটি মূলসূত্র—"কাব্যকে জানিয়া লাভ আছে সত্য, কিন্তু কবিকে জানিয়া আরও লাভ আছে"—মোহিতলাল বঙ্কিমের আলোচনাতে অতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। কবি-মনের রহস্যময় গভীরে তিনি তাঁহার ধ্যান-কল্পনা প্রেরণ করিয়া কবি তাঁহার রচনার বাহ্য অখণ্ডতার মধ্যে প্রেরণার যে অসমতা, উদ্দেশ্যের যে অস্থিরতা, সংশয়-সন্দেহের যে দ্বিধা-কুণ্ঠিত পদক্ষেপ, ভাব ও রূপের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান গোপন রাখিতে চেষ্টা

করেন, মোহিতলাল তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। সকল পাঠক ও সমালোচকই কবির অন্তরগত অভিপ্রায়টি সম্বন্ধে অনুমান করিতে চেষ্টা করেন, মোহিতলাল উহাকে নিজ নিঃসংশয় অনুভূতির স্বচ্ছ দর্পণে পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন। এই প্রয়াসে যে অতি-সাহসিকতার বিপদ ও সর্বজ্ঞতার অভিমান প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, আরোপিত উদ্দেশ্যের মানদণ্ডে বিচারের মধ্যে যে অবিচারের সম্ভাবনা ছায়াপাত করিতে পারে, সে সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে। তথাপি কবি-মন দিয়া কবিকে বুঝিবার চেষ্টা, সমধর্মিত্বের সহজ সংস্কারে কাব্যযবনিকার রহস্যভেদের প্রয়াস যে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি নূতন কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা, তাহা সর্বতোভাবে স্বীকার্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম যখন শরশয্যাশায়ী হইয়া মস্তকের উপাধান ও পিপাসানিবৃত্তির জন্য পানীয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন দুর্যোধন তাঁহার জন্য কোমল তুলার বালিশ ও স্বর্ণভৃঙ্গার ভরিয়া সুবাসিত জল আনিয়াছিলেন ; কিন্তু ভীষ্মের ইঙ্গিত বুঝিয়া অর্জুন শর-রচিত উপাধানের দ্বারাই তাঁহার অধোলুণ্ঠিত শিরকে দেহের সহিত সমোচ্চতায় স্থাপন করিলেন ও শরক্ষেপ দ্বারাই পাতালপ্রদেশ হইতে সুমিষ্ট ভোগবতীধারা উৎসারিত করিয়া সেই রণাঙ্গনশায়ী মহাবীরের তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। মনে হয় যেন বঙ্কিম-সমালোচনাক্ষেত্রে মোহিতলালের সহিত সাধারণ সমালোচনার পার্থক্য অর্জুন ও দুর্যোধনের পার্থক্যের অনুরূপ।

৩১ নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা।
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

প্রথম বক্তৃতা

[বিষয়েব গুরুত্ব; দেশ ও কাল; বঙ্কিম-প্রতিভার উদয়; বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-মানস ও কাব্য-প্রেরণাব উন্মেষ; প্রথম রচনা—'দুর্গেশনন্দিনী'।]

(১)

আমি একটি অতিদুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি; আজিকার এই বিদ্বজ্জন-সভায়—বিশেষ করিয়া—মহাসরস্বতীর এই পূজামণ্ডপে আমি আমার মৃৎকুটিরের সেই স্বল্পপ্রাণ, ক্ষীণরশ্মি সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া বাংলার সর্ব্বোচ্চ সাহিত্যিক প্রতিভার আরতি করিতে মনস্থ করিয়াছি; অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সশ্রদ্ধ পরিচয় করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এই উপন্যাসগুলিই বঙ্কিমের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তিনি যে শ্রেণীর কবি ছিলেন, বাংলার সেই শ্রেণীর কবি—তাঁহার সগোত্র বা সমকক্ষ—এ পর্য্যন্ত আর কেহ আবির্ভূত হন নাই। সেই কবি-প্রতিভা কেমন, তাহা বিচার করিতে হইলে, যে-পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান—ও কবিশক্তির মতই আর এক শক্তির প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। এজন্য আমি এতকাল বাংলা সাহিত্যের ছোট-বড় অনেক কবির সম্বন্ধে যে অনধিকার চর্চ্চা করিতে সাহস পাইয়াছি—বঙ্কিম সম্বন্ধে সে-সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। ঋষি ও মনীষী বঙ্কিম সম্বন্ধে আমি আমার সাধ্যমত যে অলোচনা বহু প্রসঙ্গে করিয়াছি, তাহাতে আমার মনের উৎকণ্ঠা নিবারিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি একরূপ শেষ করিয়াছি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কাব্যকীর্ত্তি—বাংলার কাব্যোদ্যানের সেই অনন্যসদৃশ, অতি-বৃহৎ ও দৃঢ়বৃন্ত স্থলকমলগুলির শোভা

ও মধু-সৌরভ আমার রস-চৈতন্যে যে গভীর অনুভূতির সঞ্চার করিয়াছে তাহাকে বাগর্থের পরিচিত পটে প্রসারিত করিয়া একখানি তদনুরূপ বা তদুপমেয় বাণী-চিত্র রচনা করিতে পারি নাই। তাহার প্রধান কারণ, বাংলা সাহিত্যে ঐরূপ কাব্যসৃষ্টির কোন নজির বা ঐতিহ্য নাই—আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-শাস্ত্রে উহার রূপ-রস প্রমাণ করিবার কোন মানদণ্ড যেমন নাই, তেমনই ঐ গঠন এবং ঐ আদর্শের এমন কোন কাব্য নাই, যাহার পাশে রাখিয়া তুলনার দ্বারা উহার জাতি-কুল নির্ণয় করা যায়। সত্য বটে, দেশীয় সাহিত্যে ইহার অনুরূপ আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া না গেলেও, ইংরেজী সাহিত্য হইতে নজির উদ্ধার করিয়া ঐ জাতীয় গদ্য-কাব্যের অন্ততঃ ছাঁচটা নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু বাংলার সাহিত্য-সমাজে সাহিত্যের যে সংস্কার বা মানস-অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে ঐরূপ পরিচয় করাও চলিবে না; ইংরেজী কাব্যের সেই বিকাশধারাটিকেও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-সমালোচনার ভিত্তি করিতে হয়, তাহা অসম্ভব। আমি জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, সাধারণ উপন্যাস হিসাবে—তা' সে যে শ্রেণীর হউক—বাঙালীর রুচি ও রসবোধের যেটুকু অনুকূল তাহার বেশি মূল্য সেগুলির নাই। এইজন্য ঐ উপন্যাসগুলির যথোপযুক্ত বিচার যেমন আয়াসসাধ্য, তেমনই তাহাতে আমাদের এই নিতান্ত গ্রাম্য সাহিত্য-দীর্ঘিকার জল বৃথাই আলোড়িত হইবে জানিয়া আমি এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে উৎসাহী হইতে পারি নাই।

কিন্তু সহসা—জীবনের এই প্রান্তদেশে আসিয়া কেবলই মনে হইতেছিল, একটা কাজ অসম্পন্ন রহিয়া গেল; সে-কাজ আমা-অপেক্ষা বহুগুণে উপযুক্ত কোন বড় কবি ও সমালোচক আরও উত্তমরূপে সমাধা করিবেন এ আশা আজি আর নাই। কবি ও সমালোচক বলিলাম এইজন্য যে, এইরূপ রস-নিবেদন সত্যকার রসিক না হইলে কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় না; শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"—সেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে সৃষ্টিতে সাকার দেখেন কবিরা; আবার কবির সেই সাকার কাব্য-বিগ্রহকে পূজামণ্ডপের দর্শনার্থিগণের নয়নগোচর করিবার জন্য যে মন্ত্রপাঠ করিতে হয়—তাহাতেও সেই কবির মতই অনুভূতি চাই; সেই বিগ্রহের মধ্যে কবি যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাকে নিজের প্রাণে প্রতিষ্ঠা

করিতে হয়; কেবল ঘণ্টা বাজাইলে ও দীপ ঘুরাইলেই, সেই মূর্ত্তি সজীব হইয়া উঠে না। এইজন্য ঐ যে সমালোচক, তাঁহাকেও কবি হইতে হইবে, কেবল পাণ্ডিত্যের ঘণ্টাধ্বনি করিলেই চলিবে না। সেইরূপ কবিত্ব বিদ্যা বা মেধার দ্বারা লাভ করা যায় না—"ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" ইহার উপর, আধুনিক বাঙালীর জীবনে, সমাজে, ধর্ম্মে ও চিন্তাধারায় যে বিপরীত স্রোত বহিতেছে, তাহাতে কবি-বঙ্কিমের কাব্য শ্রদ্ধা বা সহজ অনুভূতিযোগে পাঠ করাও দুঃসাধ্য হইয়াছে। এই সকল চিন্তা করিয়া, আমি এতদিন যাহা করিতে সাহস পাই নাই, আজ এই জরাব্যাধিপীড়িত দেহে, অতিশয় নিরানন্দ ও নিরুৎসাহিত চিত্তে সেই দুরূহ ব্রত স্বীকার করিয়াছি। আমি জানি, আমার হৃদয়ে আর সেই রসোল্লাস নাই, প্রৌঢ়-যৌবনের সেই স্থির ও দৃঢ় ভাবদৃষ্টি নাই; জাতি ও সমাজের সহিত সহযোগিতা ও সহধর্ম্মিতার যে স্বাস্থ্যকর ও প্রেম-সত্যময় সম্বন্ধ সাহিত্যিক ধ্যান-কর্ম্মের জন্যও অত্যাবশ্যক, তাহাও ঘুচিয়াছে,—কেন ঘুচিয়াছে তাহা বলিব না—বিশেষ করিয়া এই স্থানের এই সভায়। যাঁহারা আমার সারাজীবনের একক সংগ্রামের কথা জানেন, বা জানিয়াও অস্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে বলিবার প্রয়োজনও নাই। এই অবস্থায়, আজ আমি আমার সাহিত্য-মন্ত্রের মন্ত্রগুরু, প্রেম ও পৌরুষের, কবিত্বের ও মনীষার, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রীতির সেই যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্রের অসীম উৎকণ্ঠাময়, গভীর সংশয়-সমাকুল, কবি-কল্পনার অসম সাহসিক প্রয়াস ও দিব্যপ্রতিভার বিদ্যুৎবিভাসময় কবি-হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এ বয়সে তাহা কি উচিত, না সম্ভব? আমি বেশ বুঝিতেছি, এই যে দুঃসাহস, ইহার অনুরূপ শক্তি আমার নাই; তবু কেন যে এই শীর্ণ বাহু ও ভগ্ন গাণ্ডীব লইয়া আমি আজিকার এই রুক্ষ-কঠিন মেদিনীতল ভেদ করিয়া ভোগবতীর অমৃতধারা উৎসারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—অথবা "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদ্ উড়ুপেনাস্মি সাগরম্" তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। আমার এই উদ্যমকে আপনারা সেই চক্ষে দেখিবেন—মনে মনে বলিবেন, বাংলার যে এক গৌরবময় যুগ, সম্ভবতঃ চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে, সেই যুগের যুগনায়ক ও শ্রেষ্ঠ কবির—তাহার মতে সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির—কীর্ত্তি-কীর্ত্তন করিতেছে এমন একজন—যাহার শক্তি

নাই, কেবল ভক্তিটুকু অবশিষ্ট আছে; কিন্তু তাহা তো আজিকার গণিত-বিজ্ঞান-শোধিত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে গ্রাহ্য হইবে না; না হৌক—আপনারা কেবল আমার এই অক্ষমতাকে বঙ্কিম-প্রতিভারও পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করিবেন না। আমার এই ভয় ও নিরাশার কারণ আছে। একদিন নৈরাশ্য জয় করিবার জন্য আমি মনে মনে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিতাম, চিরবিদায়ের কালে টেনিসনের আর্থারকে তাঁহার শেষ অনুচর যাহা বলিয়াছিল আমিও তাহাই বলিতাম—

> "Ah, my Lord Arthur, whither shall I go?
> Where shall I hide my forehead and my eyes?
> For now I see the true old times are dead. . .
> And, I the last, go forth companionless,
> And the days darken around me, and the years,
> Among new men, strange faces, other minds."

তাহার উত্তরে আর্থার যাহা বলিয়াছিলেন, আপনারা সকলে তাহা স্মরণ করিবেন। কিন্তু সেই আশ্বাস বা বিশ্বাস ক্রমে ক্ষীণ হইয়াছে।

> "Old order changeth yielding place to new"

—কেন, তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরিবর্ত্তনের কথাই বলিয়াছিলেন, একেবারে উচ্ছেদ হওয়ার কথা বলেন নাই। যদি তাহাও সত্য হয়, তথাপি, এই যে যুগে আমরা বাস করিতেছি তাহাতে প্রাচীনের উচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু নবীনের আবির্ভাব এখনও সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হইতেছে। এ যেন এক সৃষ্টি ও আর এক সৃষ্টির মধ্যবর্ত্তী প্রলয়ের কাল; প্রাচীনের প্রতি আস্থা নাই, নবীনের প্রতিও বিশ্বাস নাই। এই যুগে আমি সেই প্রাচীনের যে-একটি জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভকে প্রদক্ষিণ করিতে চাহিতেছি তাহাতে আপনারা আমাকে উপহাস করুন, কিন্তু সেই জ্যোতিঃস্তম্ভকে করিবেন না, কারণ, আমি তাহার সংবাদবাহক মাত্র—আমি নিজে এই অনিত্যেরই অংশ, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যুগান্তরেও অচল অটল হইয়া বিরাজ করিবেন, কারণ, তাঁহার প্রতিভা-পুষ্পে নিত্যের অমৃত-পরাগ বিদ্যমান ছিল, তাঁহার ঐ কবিকীর্ত্তিগুলিতে 'পূর্ণের পদপরশ' লাগিয়াছিল। এইবার সেই পরিচয় আরম্ভ করি।

* * * * *

কাব্যপরিচয়ের পূর্ব্বে কবি-জীবনের ও কবি-মানসের কিছু সংবাদ লইতে হয়, এবং তাহাও বুঝিবার জন্য সেই কাল ও বিশেষ লগ্নের গ্রহ-সন্নিবেশ দেখিতে হয়। অতএব সেই কালের একটি সংক্ষিপ্ত, এবং আমাদের পক্ষে যেটুকুমাত্র প্রয়োজন, সেই পরিচয় দিব। লগ্নটি বিশেষ করিয়া সেইকালের একটা সাহিত্যিক সন্ধিক্ষণ, ভাব ও অভাবের গোধূলি-লগ্ন,—ঠিক সেই লগ্নটিতে সন্ধ্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ গত হইয়াছে; প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপরে—নির্জীব অথচ দৃঢ়মূল কতকগুলি তামসিক সংস্কারের উপরে—বিলাতী যুক্তিবাদ ও জীবনবাদের প্রচণ্ড ধাক্কা তখন কতকটা সামলাইয়া আসিয়াছে, হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গলেরা'ও তখন জাতীয় আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য সংস্কার-কার্য্যে নায়কতা করিতেছেন। আর সকল ক্ষেত্রে কোন-কিছুর স্থায়ী পত্তন করিতে না পারিলেও, বাঙালী প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায়, এক পাশে একটু দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইয়াছে,—সে সেই য়ুরোপীয় বিদ্যার বাহন ইংরেজী ভাষাকেও জাতিদান না করিয়া, নিজের মাতৃভাষাকে শক্ত ও সমর্থ করিয়া তুলিয়াছে; অন্ততঃ তাহার ভিতটা মজবুত করিয়া লইয়াছে। বেশ বুঝিতে পারা যায়, এতদিন যে বিপ্লব চলিতেছিল, তাহা মুখ্যতঃ ভাব-বিপ্লব; তাহার কারণ, ইংরেজ শাসনের সেইকালে বাস্তব জীবন-সংগ্রামের সমস্যা সাময়িকভাবে অনেকটা লঘু হইয়া আসিতেছিল; সমাজের সেই নূতনতর বিন্যাসে বাঙালীর আশা, উৎসাহ ও উন্মাদনার অন্ত ছিল না। আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল ভিতরে,—একটা ক্রম-ঘনায়মান আধ্যাত্মিক সঙ্কটে জাতির একেবারে আস্তিক্য-চেতনার গ্রন্থি-গুলায় টান পড়িয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের শান্তি ও সহজ সুখসাধনার উপায়গুলা বাঙালীকে যেমন নিশ্চিন্ত ও মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনই, জলের উপরিতলে পদ্ম যেমন স্থির-সৌন্দর্য্য বিস্তার করে, কিন্তু অন্তস্তলে জল-রাশির মধ্যে তাহার বৃন্তনাল গূঢ়সঞ্চারী স্রোতোবেগে টন্‌টন্ করিয়া উঠে—তেমনই, বাঙালী-সমাজের উপরিতলে ঐ উৎসাহ ও সুখের আশা জাগিয়া থাকিলেও, ভিতরে—সেই নব্যশিক্ষিত সমাজে—একটা গূঢ়তর মানসিক অশান্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই চেতনার উদ্রেক করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন; তখনও রীতিমত ইংরেজী শিক্ষা

আরম্ভ হয় নাই, তারপর ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও তাহার ফলস্বরূপ সমাজ-বিদ্রোহ ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা। নূতন ভাবচিন্তার আঘাতে প্রাচীন হিন্দু-সমাজে যে সাড়া পড়িয়াছিল—চারিদিকে 'গেল, গেল' রব উঠিয়াছিল, তাহাতে বাদ-প্রতিবাদই ছিল মুখ্য, এবং তাহার প্রয়োজনে বহু পত্র-পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছিল। ঐ শতাব্দীর অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইবার পর, আমরা এই কয়েকটি প্রধান ঘটনা লক্ষ্য করি;—ধর্ম্ম-সংস্কারে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা; সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন; এবং সাহিত্য-সংস্কারে 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র আবির্ভাব এবং তাহারও পরে, মধুসূদনের যুগান্তকারী কাব্য —'মেঘনাদবধ'। উহাদের মধ্যে একটিই জাতির স্থায়ী সম্পদ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়রূপে দেখা দিয়াছিল—সাহিত্যের পথে বাঙালীর ঐ নূতন জগতে পদক্ষেপ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি—ঐ যুগের যতকিছু উৎকণ্ঠা তাহা মুখ্যতঃ মানস-জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল; যাহা কিছু কর্ম্মপ্রচেষ্টা, তাহাও বাদানুবাদ, মত-প্রতিষ্ঠা ও ভাব-প্রচারের অধিক ছিল না; ইহার কারণ, ঐ জাগরণ তখনও জাতিগতভাবে হয় নাই, এমন কি, সমাজকেও—শহর-অঞ্চল ছাড়া—প্রভাবিত করিতে পারে নাই। সমাজ তখনও নিদ্রিত; বরং ইংরেজের সুশাসন-কল্পনায় নিশ্চিন্ত ও সুখনিদ্রারত ছিল। যেটুকু জাগরণ হইয়াছিল তাহার ফলে, একদিকে যেমন ঐ ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি লইয়া নানা আদর্শবাদের আন্দোলন, তেমনই, আর একদিকে, বাঙালী একটি নূতন সাহিত্যের রসাস্বাদ করিয়া, সেই রস নিজের ভাষায়, নিজের সাহিত্যে পান করিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়াছে। মধ্যে কবিওয়ালা, পাঁচালী, যাত্রাগান হইতে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, বিশেষ করিয়া, তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির নানা নিদর্শনে, সেকালের ইংরেজীনবিশ তরুণেরা বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ও তাহার সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছিলেন। ইহার পরে বিদ্যাসাগরের অভিনব ছন্দের গদ্যরচনা এবং মধুসূদনের ঐ কাব্য,—বেশ একটু আশার কথাই বটে। অতএব, নবযুগের প্রভাব বাঙালীর রস-জীবনে সাড়া জাগাইয়া একটা নূতন সাহিত্যকেই নবভাবের আধাররূপে গড়িয়া তুলিবে, এমন সম্ভাবনাই দেখা দিয়াছিল। উপরের দিকে—অর্থাৎ যাহারা ইংরেজ-শাসন ও

ইংরেজী শিক্ষার দৌলতে অচিরেই জাতির নেতৃত্বপদ অধিকার করিবে, তাহাদের জীবনে ঘোরতর আধ্যাত্মিক সঙ্কট অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে; কেহ নাস্তিক, কেহ ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ, কেহ বা সমাজ-বিরোধী স্বতন্ত্র-সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ঐ নীচের দিকে—সর্ব্বসাধারণের মিলনভূমিতে, একটা সাহিত্যের আসর গড়িয়া উঠিতেছিল; যাহারা ঐ সমস্যা-সঙ্কট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, বা ভ্রূক্ষেপহীন, অথচ যাহাদের সচেতনতার উপরেই জাতির আত্ম-পরিত্রাণ নির্ভর করে, তাহারা আর কোনদিকে সাড়া দিবে না, তার কারণ, তাহারা বাঙালী; মেধা, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি যতই থাকুক না কেন, তাহারা দিনগত-পাপক্ষয়ের অধিক সুখ চায় না; সেই সুখতন্দ্রার আলস্য ত্যাগ করাইতে হইলে চাই তাহার ভাব-জীবনে গভীরভাবে নাড়া দেওয়া। এ জাতিকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে হইলেও—জ্ঞানের পথে নয়, প্রাণের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিতে হইবে; অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তত্ত্ব থাকিবে না, তাহাকে রস হইয়া উঠিতে হইবে।

এই যে এত পুরাণো কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম—তাহা অবান্তর নয়; বঙ্কিম-প্রতিভা যে শুধুই বড় নয়—কিরূপ কালোচিত, তাহাও বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে; আবার, সেই অতি-উচচ কবি-প্রতিভাতেও কি কারণে সূর্য্যের পার্শ্বচারিণী ছায়ার মত একটা বিপরীত প্রেরণাও সদা-সংযুক্ত হইয়া আছে, তাহারও একটা হদিশ এইখানে মিলিবে।

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের উদয়কাল ইহারই কিছু পরে। তিনি একাধারে কবি ও মনীষী; বাংলায় তথা ভারতের ইতিহাসে, সেই যে যুগসন্ধিকাল, তাহার সমস্যাও তাঁহাকে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল, বোধ হয়, সেই উৎকণ্ঠা-নিবারণ তাঁহার নিজের প্রাণের পক্ষেও প্রয়োজন হইয়াছিল। অতএব আমরা যখন তাঁহার কবিকীর্ত্তির একটা স্বতন্ত্র পরিচয় করিতে বসিয়াছি, তখন তাঁহার কবি-মানসের অপর পার্শ্বে ঐ যে আর একটা ভাবনা সদা-জাগ্রত ছিল তাহারও কিছু সংবাদ লইব। একই জীবনে

এই দুইটি বৃত্তি—একটা জ্ঞানবৃত্তি, এবং অপরটা রস-কল্পনা-বৃত্তি—প্রায় একসঙ্গে সমান শক্তিশালী হইতে দেখা যায় না ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় এই দুইয়ের আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়াছিল। ইহার ফলে, তাঁহার চিন্তারাজিতে—সেই সংশয়-সমস্যার মীমাংসায়, যেমন প্রতিভার দিব্যদৃষ্টির পরিচয় আছে, তেমনই তাঁহার উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তিও তত্ত্ব-দৃষ্টিবর্জিত নয়। তাই বঙ্কিম-প্রতিভাকে একটা পূর্ণতর চিৎশক্তি, বা সমগ্র পুরুষ-সত্তার উদ্বোধন বলা যাইতে পারে ; তাঁহার সেই কবি-মানসও একটা বৃহত্তর ব্যক্তি-মানসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমন প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ বৃন্তহীন পুষ্পের মত নয়—মূলে তাহা দৈবী হইলেও, এবং সেই কারণেই তাহার প্রকাশের ক্ষণটি পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অগোচর থাকিলেও, তাহা একটা দৃঢ়বৃন্তকে আশ্রয় করিয়া স্বভাবের নিয়মেই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সেই উন্মেষ ও পুষ্টির একটা ইতিহাস নিশ্চয় আছে। আবার, প্রতিভারও জাতিভেদ আছে ; শক্তি যেমন বহুরূপা, কবি-প্রতিভাও তেমনই এক স্তরের বা এক প্রকৃতির নয়। কোন প্রতিভা অঙ্গারে অগ্নিদীপ্তির মত, তাহার স্পর্শে অতি-মূর্খও বাণী-কণ্ঠ হইয়া উঠে। তথাপি, একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃদঙ্গার যেরূপ উজ্জ্বলতা ধারণ করে, একটা হীরকখণ্ড সেই আলোকে তদপেক্ষা দীপ্তিমান হয়। আবার, কবিদিগকে বিদ্বান হইতে হয় না বটে, কিন্তু জ্ঞানী হইতে হয় ; সেই জ্ঞান তাঁহারা ঐ দিব্যশক্তির বলে আর এক উপায়ে শোষণ করিয়া লন ; মহাকবি শেক্সপীয়ারের ঐশী প্রতিভাও তেমন জ্ঞানের সাপেক্ষতা স্বীকার করিয়াছিল—সে জ্ঞান যেমন করিয়াই আহৃত হউক না কেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাও যেমন—সেই প্রতিভার উন্মেষও তেমনই বিচিত্র বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রথম দিকে কাব্যপ্রীতি অপেক্ষা জ্ঞান-পিপাসাই অধিক ছিল, বিদ্যার অনুশীলন তিনি প্রথম হইতেই কিছু অধিকমাত্রায় করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেতিহাস নাই ; যাহা আছে তাহা এমনই অসম্পূর্ণ, কিংবা সচ্ছন্দ-বিদ্যার জল্পনা-কল্পনাপূর্ণ যে, তাহা হইতে এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমি কয়েকটি তথ্য, এবং আরও কয়েকটি ইঙ্গিতমাত্র সঙ্কলন করিয়া একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-পাঠে এমন আসক্তি ছিল যে, কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ তাহা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ মন্তব্য করিয়াছিলেন। সেই বয়সেই তিনি য়ুরোপীয় ইতিহাসের বড় বড় গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ইতিহাস-পাঠ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে কিরূপ উজ্জীবিত করিয়াছিল তাহা আমরা জানি, শুধু তাহাই নয়, তাঁহার জীবন-দর্শনের একটা বড় সহায়তাও করিয়াছিল। ঐরূপ পাঠ-পিপাসা একটা বৃহত্তর পিপাসার অধীন ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেই পিপাসার বশেই তিনি বয়োবৃদ্ধির সহিত য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিও প্রাণের আকুলতাসহকারে অধিগত করিয়াছিলেন। ঐকালে তিনি ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্য, এবং অনুবাদে য়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্য—প্রাচীন ও আধুনিক—যথারুচি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রসপিপাসু মনের পর্য্যটন-পরিধিও অনুমান করা দুরূহ নয়;—কোন্ কোন্ তীর্থে তিনি হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত তাঁহার রচনার কোন কোন স্থানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই ছিল, তাঁহার প্রতিভার সেই "capacity for taking infinite pains"। আমরা আজকাল প্রতিভার প্রধান প্রমাণ ইহাই স্থির করিয়াছি যে, উহার সহিত কোন সাধনা বা শ্রমের সম্পর্ক নাই—উহা আদৌ স্বয়ম্ভূ।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-প্রকৃতির সেই ক্ষুধা ও তাহার পথ্যসংগ্রহের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। ঐ ক্ষুধা কখন্ হইতে জাগিয়াছিল, তাহা জানা না গেলেও, উহা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং শেষে উহাই একটা আধ্যাত্মিক সত্যপিপাসায়,—তথা জীবন-জিজ্ঞাসায়—পরিণত হইয়াছিল, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনায়—কোথাও তত্ত্বের নিরন্তর বিচারে, কোথাও কাব্যের অত্যুচ্চ কল্পনায়—জাজ্বল্যমান হইয়া আছে। আমরা ইহাও জানি যে, বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে একরূপ নাস্তিক হইয়াছিলেন—অর্থাৎ এই জগৎ ও জীবনের বাহিরে, ইহার ঊর্দ্ধে ঈশ্বর-নামক সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও ন্যায়বান কোন নিয়ন্তা আছেন, সে বিশ্বাস হাবাইয়াছিলেন; অথচ মনুষ্যজীবনকে তুচ্ছ করিতে পারেন নাই, এবং এই জীবনকেই সার্থকতা দান করিবার জন্য একটি দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন,—তিনি

Auguste Comte-এর প্রত্যক্ষ-মানবধর্ম্মবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি নিজেরই জবানীতে এইরূপ আত্মকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা—

"অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি; তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা-সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি।"

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই এক জিজ্ঞাসা ঘুচে নাই—তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই—

"পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর, এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন পত্নীজারেও ভোগ করে; মানসম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না।" [কমলাকান্ত]

এই প্রাণময় উৎকণ্ঠা যে কবিশক্তিকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা যে কেবল কাব্যের 'বিলাস-কলা-কুতূহল'—এমন কি, আত্মমানসের আর্টিপিপাসা নিবারণের জন্যই নয়, পরন্তু তাহাতে সেই বিরাট জিজ্ঞাসা ও গভীর সংশয়ের—সেই 'burden of the mystery' যতকিছু আকুতি ও আক্ষেপ অতিগভীর ছন্দে উৎসারিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। "এ জীবন লইয়া কি করিব?"—এ প্রশ্নের যে জীবন,

তাহা ব্যক্তির জীবন নয়, নিখিল মনুষ্যজীবন,—যে-জীবনের সহিত মিলাইয়া নিজ জীবনের অর্থ করিতে হইবে; তাহা একটা আত্ম-ভাবানুরূপ—egoistic, সুমার্জিত নীতির ফ্রেমে-বাঁধা জীবন নয়; সে-জীবন নীতি-দুর্নীতির যতকিছু দ্বন্দ্ব, প্রেয় ও শ্রেয়ের সমস্যা, এবং মনুষ্যহৃদয়ের প্রবলতম প্রবৃত্তির রঙ্গস্থল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই জীবনের রহস্যভেদ করিতে চাহিয়াছিলেন; বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য-অর্জনই সেই ক্ষুধার কারণ নহে।

কিন্তু তরুণ বয়স হইতেই এই যে জিজ্ঞাসা—এই যে জ্ঞানের অনুশীলন, বা নানা বিদ্যা-অর্জনের তপস্যা ইহা কি ভবিষ্যৎ কবিকর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হওয়া? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা সঙ্কল্পের পরিচয় ঐ কালের অন্য আচরণে পাওয়া যায় না। তাঁহার হৃদয় ও মন যেভাবে পুষ্ট হইতেছিল, যে প্রচুর পথ্য সংগ্রহ করিতেছিল তাহা যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহাকে সেই মহান্ কবিকর্ম্মের যোগ্য করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই যে, মহাকবি মিলটনের মত সেই মহান্ কবিব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই তিনি ঐরূপ তপস্যায় রত হন নাই; আবার, জীবনের যে রুদ্র-ভীষণ মূর্ত্তির সম্মুখে দীর্ঘ দিন একাসনে বসিয়া, এবং বারবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এবং প্রতিবার শেষ মুহূর্ত্তে মুক্তি পাইয়া, রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ডস্‌টয়েফ্‌স্কি, অবশেষে যেমন মনুষ্যজীবনের মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-প্রেরণা সেইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। বরং তাহা একটু অপ্রত্যাশিত বলিয়াই মনে হয়—সে যেন তাঁহার অন্তরে ঊর্দ্ধ হইতে একটা দিব্য আলোকরশ্মিপাতের মত। কারণ, প্রথমতঃ, তিনি তৎপূর্ব্বে প্রাণ-মনের ঐ পিপাসা মিটাইতেই ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না; বালকবয়সে তিনি ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকরে' কয়েকটি পদ্য লিখিয়াছিলেন, পরে যেন অতিশয় লজ্‌জিত হইয়াই সে অভ্যাস ত্যাগ করেন। তারপর, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সমুদ্রতীরে বিচরণ করিয়াছিলেন; তাহাতে মনের যে প্রসার, এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে যে উচ্চাভিমান হওয়া স্বাভাবিক, তাহাই তাঁহাকে স্বয়ং লেখনীধারণে নিবৃত্ত করিয়াছিল —এমনই মনে হয়। এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার সেই সাহিত্যিক

উচ্চাশয় তৃপ্ত করিবার পক্ষে যে ভাষা ও যে ছাঁচের প্রয়োজন, তাহার পক্ষে ঐকালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যিক রুচি—একদিকে গ্রাম্যতা, এবং অপরদিকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সেই পণ্ডিতী-কাব্য অতিশয় অনুপযোগী বলিয়া—তেমন প্রয়াস নিষ্ফল মনে করিয়াছিলেন। অন্ততঃ ইহা সত্য যে, তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস রচনা করিবার পূর্ব্বে বাংলা গদ্যের কোনরূপ চর্চ্চা করেন নাই, বরং তাহার যে একটু নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা ভয়াবহ বলিলেও হয়। অতএব, সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তিনি যেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের রচনার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না, তেমনই মাতৃভাষায় সাহিত্য-রচনার সঙ্কল্প তাঁহার নিজেরও ছিল না।

আমি এখানে তাঁহার প্রথম রচনা ইংরেজী 'Rajmohan's Wife' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না, তাহার কারণ, ঐ রচনাটিতে বঙ্কিমী কাব্য-কল্পনার পূর্ব্বাভাস নাই; উহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, যুবক বঙ্কিমচন্দ্র বিলাতী উপন্যাস-রসও প্রচুর পরিমাণে আস্বাদন করিতেছিলেন, এবং তাহার ফলে সেই কবিতা-লেখার মতই, একরূপ সৌখীন সাহিত্য-চর্চ্চায়, অবসরবিনোদনের ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে এই সময়ে বহু বিলাতী উপন্যাস এবং বিশেষ করিয়া রোমান্সজাতীয় আখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য তাঁহার রচনার মধ্যেই আছে। তিনি স্যার ওয়াল্টার স্কট, লর্ড লিটন, এমন কি উইল্‌কি কলিন্সের উপন্যাস বিশেষ অনুরাগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়টও নিশ্চয় পড়িয়াছিলেন। রোমান্স-গুলির পরে সম্ভবতঃ ডিকেন্সের নভেল তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল—'কমলাকান্তের দপ্তরে' Pickwick Papers-এর একটু গন্ধ আছে। তথাপি রোমান্সই দুই কারণে প্রিয়তর ছিল বলিয়া মনে হয়; প্রথমতঃ সেগুলির গল্প-রস; দ্বিতীয়তঃ কল্পনার ঐশ্বর্য্য। পরে তিনি ফরাসী মহাকবি ভিক্টর হুগোর উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন, এবং হয়তো স্কট অপেক্ষা তাঁহার সহিত অধিকতর সগোত্রতা অনুভব করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সকল হইতে কেবল ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মত বিদেশীয় সাহিত্য-রসও পূরামাত্রায় আস্বাদন করিতেন। শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। সেকালের ইংরেজীনবীশ বাঙালীর পক্ষে শেক্সপীয়ার-পাঠ হিন্দুর

মহাভারত পাঠের মতই ছিল। আমি এক্ষণে তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক রস-চর্চ্চার কথা বলিতেছি—কবি-বঙ্কিমের কাব্য-প্রেরণা সম্বন্ধে বলিবার সময় এখনও আসে নাই। ঐ Rajmohan's Wife-রচয়িতা তখনও সেই 'বঙ্কিমচন্দ্র' হইয়া উঠে নাই।

(৩)

"Rajmohan's Wife" ইং ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়—উহাকেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যরচনা বলিতে হইবে। যুবক বঙ্কিম যে প্রেরণার বশেই ঐ উপন্যাস রচনা করিয়া থাকুন না কেন, তিনি পরে উহাকে একরূপ গোপন করিয়াছিলেন—তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, ঠিক ঐ সময়েই বা কিছু পরে, তাঁহার 'অন্তর-দেবতা' জাগিয়া উঠিয়াছিল, সজ্ঞানে না হইলেও—একটা প্রবল প্রবর্ত্তনা, ভিতর হইতে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি যে 'Rajmohan's Wife'কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব মনোভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন—নব্য ইঙ্গবঙ্গ-সমাজ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পরম আগ্রহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ; পরে তাঁহার সেই অন্তরপুরুষ মাতৃভাষায় ঐ সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে এক চির-দূরায়মান অথচ উত্তরোত্তর ব্যাকুলতা-সঞ্চারী পরম-তীর্থের পথে যাত্রা করাইয়াছিল ; বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র কবিজীবন—তাঁহার উপন্যাসমালার সেই ক্রমপ্রসারিত ডোবটি—নিরীক্ষণ করিলে তাহাই বিশ্বাস হয়। যাত্রাকালে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় সজ্ঞানে তাহা অনুভব করেন নাই—তাঁহার কবি-আত্মার সেই অভিযান একরূপ নিরুদ্দেশযাত্রার মতই ছিল। আমরা আজ যাহা সহজেই দেখিতে পাই, সেদিন তিনি তাহা দেখিতে পান নাই—পাইলে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আরম্ভ করিয়া 'সীতারামে' পৌঁছিতেন না। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানস যেদিকে মুখ ফিরাইয়াছে, তাহা নিতান্তই রোমান্স-পন্থা বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে

যদি তিনি ঐরূপ -কাঁচা রোমান্স-রসের পুনরাবৃত্তি করিতেন, তবে আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিতাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিছক কাব্য-রচনা,—অর্থাৎ, 'চিত্তরঞ্জিনী'-বৃত্তির অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই করিতে মনস্থ করেন নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যুবক-বঙ্কিম সেই কাব্যকলার শাস্ত্র-বিধিই মান্য করিয়া দুইটি বিষয়ে নিজের কবিশক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন—প্রথম, গল্প -নির্ম্মাণের শক্তি; দ্বিতীয়, নরনারীর হৃদয়াবেগকে গীতিকাব্য হইতে কাহিনীকাব্যে পাত্রান্তরিত করিয়া, তাহাকে নাটকীয় ঘটনামুখে বিস্ফুরিত করিবার শক্তি। এই দুই-ই তাঁহার কবি-জীবনের সেই যাত্রারম্ভে প্রধান পাথেয় ছিল। জীবনের রোমান্স ও কাব্যের রোমান্স এক নহে, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র যে জীবন-কাব্য রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে হৃদয়ের প্রবলতম অনুভূতিকে নাটকীয় ঘটনা-সন্ধিতে প্রত্যক্ষ-গোচর করাইতে হইবে; বঙ্কিম তাঁহার কাব্য-গুলিতে তাহাই করিয়াছিলেন, না করিতে পারিলে সেই উপন্যাসগুলা কাব্যের রোমান্স হইত, জীবনের কাব্য হইত না।

(বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচিত্তের জাগরণ বা প্রতিভার প্রথম প্রস্ফুরণ এইরূপে ঘটিয়াছিল। তথাপি তাঁহার কবিরূপে ঐরূপ আত্মপ্রকাশ এইজন্য বিস্ময়কর যে, যে-ধরণের বিদ্যানুশীলন এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসার যে উচচাভিমান ঐকালে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল তাহাতে সহসা এই পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে। সেকালের পাঠকসমাজ—তাঁহার সমসাময়িক শিক্ষিত সম্প্রদায়ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবে রীতিমত বিস্ময়বোধ করিয়াছিল। আজ আমরা আরও এক কারণে বিস্মিত হই। যে বঙ্কিম ইতিপূর্ব্বে, সেই তরুণ বয়স হইতেই জীবনের রহস্য-যবনিকা অপসারিত করিয়া, তাহার অন্তরালে মৃত্যুর অমৃত-রূপ দেখিবার আশায় অধীর হইয়াছিলেন, য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের তীর্থে অঞ্জলি ভরিয়া জীবন-যজ্ঞশালার সেই সোমরস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, এবং শেষে তাঁহার পুরুষ-আত্মার তীব্র উৎকণ্ঠা তাহাতে নিবারিত না হওয়ায়, জীবনের সেই মহা-নেপথ্য সম্বন্ধে নাস্তিক হইয়া ওপার হইতে এপারে দৃষ্টি ফিরাইয়া, প্রত্যক্ষ-মানবধর্ম্মবাদের আশ্রয় লইয়াছেন—তাঁহার পক্ষে ঐরূপ একটা কাব্যপ্রণয়নের লঘুলীলা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? ইহাই বিস্ময়কর। কিন্তু প্রতিভার জন্ম—

উৎকৃষ্ট কবি-শক্তির উন্মেষ এমনই নিয়তি-নিয়ম-বহির্ভূত। যাহাকে লঘুলীলা বলিয়া মনে হইয়াছিল, পরমুহূর্ত্তে তাহাই বৈশাখী ঝটিকার রুদ্র-কান্ত মেঘ-নীল জ্বলজ্‌জটায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে—'কপালকুণ্ডলা'ও কাব্য, এমন কাব্য জগতের কথাসাহিত্যে অল্পই আছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি সৃষ্টির তলদেশে একটা মিষ্টিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মনুষ্য-নিয়তির দুর্জ্ঞেয়তাকেই ঘনাইয়া তুলিয়াছে। উহাতে তিনি যে মহাশক্তির ধ্যান করিয়াছেন তাহা সাধারণ মানব-চৈতন্যের অতীত—তাহার নিকটে তিনি কীটানুকীট মানুষকে অতি-অসহায় ও শক্তিহীন দেখিয়াছেন। এই দৃষ্টি সেই প্রতীচ্য জীবন-দর্শনেরই প্রাচ্য প্রতিক্রিয়া। ইতিপূর্ব্বে য়ুরোপের ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধিগত করিয়াছে যে অসামান্য মেধা ও ভাবুকতার অধিকারী, সেকালের এক সুস্থ সবল বাঙালী সন্তান—যেন সহসা সেই সকলের আঘাতেই তাহার কুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপ ফরাসী-বিপ্লবের সেই নরমেধ যজ্ঞে যে হবিঃশেষ পান করিয়া নব আশা ও উন্মাদনায় অধীর হইয়াছে—যুবক-বঙ্কিমও সেকালের বঙ্গীয় ইংরেজ-গুরুর মুখে তাহারই মন্ত্রে দীক্ষিত, এবং সেই সাহিত্যতন্ত্রে শিক্ষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা তাহাতে নিবারিত হয় নাই, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এতদিনে তাঁহার সেই অশান্ত চিত্তের অসীম উৎকণ্ঠা—সকল তত্ত্ব, সকল চিন্তা, ও মতবাদকে সবলে অপসারিত করিয়া, সেই শক্তির—সেই প্রকৃতিরূপা মহামায়া-শক্তির মুখামুখী দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রকৃতিকে তিনি য়ুরোপের জীবন-গ্রন্থেই সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তারপর, যেন সহসা তাঁহার দৃষ্টি আরও ভিতরে প্রবেশ করিল; তাঁহার বাঙালী-দেহের রক্তগত তান্ত্রিক সংস্কারে উহার ধাক্কা পৌঁছিবামাত্র, আমি যাহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলিয়াছি—তাহাই ঘটিয়াছিল, সাধারণ ভাষায় তাহার নাম প্রতিভার পূর্ণ-জাগরণ। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে একটা আবেগ মাত্র আছে, তাঁহার কবি-মানসের স্বপ্নাবেশ আছে, 'কপালকুণ্ডলা'য় পূর্ণ-জাগরণ ঘটিয়াছে।

কিন্তু এইখানেই,—উপন্যাসগুলির ভিতরে আরও প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে—আমি একটু ভূমিকা করিয়া রাখিব। প্রথমেই ঐ উপন্যাস-গুলির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যে একটি উক্তি করিয়াছিলেন তাহা

উদ্ধৃত করিব। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাসকলের ব্যাখ্যামাত্র। এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া, কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধিত হই।"

—কথাটা সহসা কবির উক্তি বলিয়া মনে হইবে না—দার্শনিক বা তত্ত্ববাদীর হুঙ্কার বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু কবি-প্রবৃত্তি বলিতে যে একটা গভীরতর প্রেরণা বুঝায়, উহাতে তাহারই গূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে। খাঁটি কাব্য-প্রেরণা বলিতে আমি কবির সেই চেতনার স্ফুরণ বুঝিব—যাহাকে একজন বড় ইংরেজ সমালোচক কবির সমগ্র-সত্তার পূর্ণজাগ্রত চেতনা বলিয়াছেন; অর্থাৎ, চিন্তাবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বৃত্তি—Intellectual, emotional ও moral—এই তিনের যুগপৎ উদ্দীপনা যাহাতে হইয়া থাকে। আমি কবি-বঙ্কিমের সেই পূর্ণজাগ্রত চৈতন্যের কথাই বলিতেছি—যাহাতে মানবজীবনের ঊর্দ্ধ হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত সকল সোপান একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়; উহাই একাধারে—Intellectual, emotional ও moral। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে একটা দ্বন্দ্বের আভাস ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি; কবিজীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা আরও গভীর ও দূরপ্রসারী হইয়া উঠিয়াছে। সেই দ্বন্দ্বই সমগ্র জীবন-চেতনা তথা কবি-চেতনার মূলে নাড়া দিয়াছে। যেহেতু তাহাতে চিন্তাও আছে, হিতাহিতবুদ্ধিও আছে, অতএব উহা উৎকৃষ্ট রসাবেশ নয়—এমনই একটা আপত্তি চিরদিন উদ্যত হইয়া আছে। আপত্তির কারণ এই যে, কাব্যে কোন চিন্তাবস্তু, কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা বা সিদ্ধান্তপ্রবণ মনোবৃত্তির স্থান নাই। পূর্ব্বোক্ত সমালোচক বলেন, ঐরূপ কাব্য বিশুদ্ধ রস বটে, কিন্তু—

"But the problem of life remains. High speculations still confront the serious spirit—Its own high speculations, its own moral bewilderments must have place in a poetic experience that shall be adequate to its own potentiality.

Those thoughts on Nature and on human life which Matthew Arnold so earnestly desiderated are indeed to be required of the poet who is to receive his guerdon, not merely of poetic 'purity' but of poetic greatness also."

এই যে উক্তি উদ্ধৃত করিলাম ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানস ও তাঁহার উপন্যাসগুলির কাব্য-প্রেরণা সম্বন্ধে সকল কথাই—যেন ঠিক আমাদের এই আলোচনার প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। ঐ যে 'serious mind' এবং 'high speculation'—ঐ দুইটি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসেও তাহাই হইয়া আছে। আবার, প্রকৃতি এবং মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে যে সুগভীর ধ্যান-চিন্তা—ম্যাথু আর্নল্ডের মতে কাব্যের উপাদান-বস্তু না হইলে তেমন কাব্য শ্রেষ্ঠ কাব্য নহে—কাব্যের রস শুধুই বিশুদ্ধ হইলে চলিবে না, কাব্য মহৎ হওয়াও চাই, এই শেষ কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য আর কোন বাঙালী কবি সম্বন্ধে তেমন নয়।

অতঃপর, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবন ও কবি-মানসের এই জাগরণ-বর্ণনার পর, সেই মানসের একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া, বঙ্কিমের পুরুষ-আত্মার উৎকণ্ঠাও যেমন—তেমনই, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে সেই কবি-মানসের অভিব্যক্তি বুঝিবার চেষ্টা করিব। আজ এইখানেই শেষ করিলাম।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

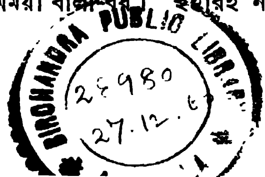
[বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-প্রেরণা ও জীবন-জিজ্ঞাসা ; 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'—জীবন-রহস্য ; পাশ্চাত্ত্য কবি-দৃষ্টি ও হিন্দু-চিন্তা ; উপন্যাসের প্লট ও সমগ্র-দৃষ্টি ; 'কপাল-কুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' ; বঙ্কিম-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-কাল—'বিষবৃক্ষ' ।]

(১)

ইতিপূর্ব্বে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যপ্রেরণার মূলে একটা বড় জিজ্ঞাসার কথা উল্লেখ করিয়াছি। এ জীবনের অর্থ কি ?—ইহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের যেন আজন্মের জিজ্ঞাসা—উহাই ছিল তাঁহার একমাত্র প্রশ্ন ; এ প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য তিনি আদৌ ধর্ম্মশাস্ত্র বা অধ্যাত্ম-দর্শনের শরণাপন্ন হন নাই। নচিকেতা যেমন মৃত্যুর মুখে অমৃতের গুহ্যতত্ত্ব শুনিতে চাহিয়াছিল, বঙ্কিমও তেমনই জীবনের মুখেই মৃত্যুর কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন; কারণ, জীবনকে জানিলেই মৃত্যুকে জয় করা যায়। বুদ্ধ জরা ও মৃত্যুকে দেখিয়া জীবনকেই অস্বীকার করিয়াছিলেন ; আধুনিক মানুষ, তথা সেই মানুষের কবি-চৈতন্য তেমন করিয়া সকল দ্বন্দ্ব, সকল সংশয় নিরসন করিতে চায় না ; জীবনকে ছোট করিতে পারে না, মানুষের প্রাণের ক্ষুধাকে ইন্দ্রিয়পিপাসা বলিয়াই তুচ্ছ করিতে পারে না ; বরং সেই ইন্দ্রিয় হইতেই যে অতীন্দ্রিয় পিপাসা জাগে, অথবা ঐ ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই অতীন্দ্রিয়ের যে গহন-গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহাই চিন্তা করিয়া, এবং সে রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া উন্মনা হইয়া উঠে। এই রহস্য ও তাহার সংশয় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-জিজ্ঞাসা হইতেই কাব্যপ্রেরণায় পরিণত হইয়াছিল। মানবাত্মা ও প্রকৃতি এই দুইয়ে মিলিয়া মানব-জীবন। 'The spirit of Man' প্রকৃতি হইতে যে স্বতন্ত্র, অথচ প্রকৃতির সহিত নিত্য-সংবদ্ধ, ইহা শুধু কপিল নয়—চিন্তাশীল মানুষমাত্রেই সরলভাবে বুঝিতে

পারে। জীবনকে চাও তো প্রকৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিবে না, বরং উহাই কামনা করিবে—ঐ প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত যে পুরুষ বা আত্মা তাহা কপিলবর্ণিত মুক্তপুরুষ বটে, কিন্তু সেগুলা যে কি পদার্থ তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। বঙ্কিম আরম্ভ করিয়াছিলেন জীবনের অর্থ কি, এই জিজ্ঞাসা লইয়া; তিনি এমন অর্থই খুঁজিতেছিলেন যাহাতে জীবনের একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায়;—এই জীবন-প্রীতি তাঁহার ধাতুগত। ভাবিয়াছিলেন ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান হইতেই তিনি জীবনের একটা অর্থ করিয়া লইতে পারিবেন; আমরা জানি, তিনি তাহা করিয়াছিলেনও; তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে একটা রফা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পুরুষকে জয়ী করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সেই শ্রুতি ও মেধার দ্বারা সত্য-সন্ধানের প্রয়াস—এ প্রয়াস তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই; তাঁহার কবি-জীবনের সহিত ঐ মনোজীবনের একটা যেন প্রতিযোগিতা শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই তথ্যটি আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—তাঁহার উপন্যাসের রসাস্বাদনে ঐ দ্বন্দ্বই বেরসিক পাঠককে পদে পদে অপদস্থ করিয়াছে; আমি পরে উহার সবিশেষ আলোচনা করিব। এক্ষণে, বঙ্কিমের কাব্যপ্রেরণার কথাই বলি। জীবনের প্রতি ঐ যে মমতা, উহার বশে কবি-বঙ্কিম সেই জীবনের রহস্য-সন্ধানে—আর সকল ছাড়িয়া ঐ প্রকৃতির দিকে স্থির ও গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রকৃতি বলিতে সেই অপরা-শক্তি—যাহা আকাশের গ্রহনক্ষত্র হইতে মাটির তৃণ ও মানুষের দেহ, সর্ব্বত্র একই নিয়মপাশ বিস্তার করিয়াছে—আমরা যাহাকে বহির্জগৎ বলি তাহার সহিত এই দেহ-যোগে আমাদিগকে এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছে। আকাশে যাহা ঝড়ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎরূপে গর্জিয়া উঠে; পৃথিবীতে ভূমিকম্প, দাবানল, মহাযুদ্ধের রক্তবন্যায় যাহা কালকেও অকাল করিয়া তোলে, তাহাই মানুষের জীবনে, তাহার সেই দেহ ও দেহনিহিত হৃদয় বা মন-প্রাণকে আলোকে-আগুনে—প্রেমে ও কামে—ভস্ম বা ভাস্বর করে; উহার সেই লীলায় সৃষ্টি ও ধ্বংস দুই-ই অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। ইহাই 'প্রকৃতি',—ইংরেজী Nature শব্দের মত ঐ বাংলা নামটিও আমরা বহু অর্থে ব্যবহার করি; কিন্তু উহা মূলে সেই শক্তি—যাহার ক্রিয়া আমরা বহুরূপে ও বহু ঘটনায় অন্তরে ও বাহিরে

প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কবি ও মনীষীরা যখনই জীবনের রহস্য ধ্যান করিয়াছেন, তখনই এই প্রকৃতির সহিত মুখামুখী করিতে হইয়াছে এবং স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, জীবন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ঐ প্রকৃতি-শক্তিরই একটা অংশ—এই দেহ তাহারই লীলাভূমি; মানুষ যদি এই দেহ হইতে পৃথক একটা আত্মার অস্তিত্ব নিজের মধ্যে অনুভব করে, তাহা হইলে সেই আত্মা ঐ দেহেরই রচিত মন বা হৃদয় নামক একটা বন্ধনরজ্জুর দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে; যতদিন জীবন আছে, অর্থাৎ ঐ দেহধর্ম্ম আছে, ততদিন প্রকৃতির শাসন দুর্লঙ্ঘ্য। সাধারণ মানুষ এত চিন্তা করে না, সাক্ষাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণার খাদ্য-পানীয়-সংগ্রহই তাহাকে আমরণ ক্ষুদ্র সুখ ও ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু কবি ও ঋষির মধ্যে সেই জীবনানুভূতিই প্রখর হইয়া ললাটে তৃতীয় নেত্রের মত ঐ একটা দৃষ্টিশক্তির উন্মেষ করে—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজেই বিদারণ করিয়া অবিচলিত দৃষ্টিতে তাহার স্নায়ুশিরার বিচিত্র বিন্যাস নিরীক্ষণ করার মত, তাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে ঐ প্রকৃতির দুশ্ছেদ্য নিয়তি-জাল ও তাহার বয়ন-কৌশল ভেদ করিয়া অভয় হইতে চান। কিন্তু সে রহস্য দুর্ভেদ্য—একমাত্র উপায় তাহাকে ছিন্ন করা, অথবা সাংখ্যের অসঙ্গ পুরুষের মত তাহার বিদ্যমানেই তাহা হইতে দূরে থাকিবার সাধনা করা। ঋষি-মনীষিগণ তাহাই করেন, কবি তাহা পারেন না—পারিলে তিনি কবি হইতেন না। তাঁহাকে ঐ দ্বন্দ্ব স্বীকার করিতে হয়—অর্থাৎ পুরুষ বা মানবাত্মা এবং প্রকৃতি-শক্তি, এই দুইয়ের নিত্যসঙ্গ রক্ষা করিয়াই এমন একটা ভাবভূমি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়—যাহাতে ঐ প্রকৃতিকে একই কালে 'সনাতনী' ও 'মিথ্যাভূতা' বলিয়া নিজের নিকটেই নিজে অপদস্থ হইতে না হয়; বরং তাহাকে শিবসীমন্তিনী রূপে বরণ করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যায়। 'শিবসীমন্তিনী' নামটি পুরাণের—কিন্তু তাই বলিয়া উহা জ্ঞানী-দার্শনিকের অবহেলার যোগ্য নয়, বরং গভীর শ্রদ্ধার সহিত চিন্তনীয়। 'শিব' অর্থে মহাশক্তিমান মানবাত্মা; সেই মানব-পুরুষকে বীর হইতে হইবে—শুধুই হরধনু নয়, কামধনু ভঙ্গ করিতে হইবে; বসুন্ধরা যেমন বীরভোগ্যা, তেমনই ঐ প্রকৃতিও কামধনুভঙ্গকারী, চন্দ্রমৌলী ও ত্রিলোচন শিবের কণ্ঠ-লগ্না পরমপ্রেমময়ী বালা-বধূ। ইহারই নাম high speculations,



ইহা সেই thought on nature and human life —যাহাকে ম্যাথু আর্নল্ড শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপজীব্য বলিয়াছেন। আমি মানব-জীবনঘটিত সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য, সেই সমস্যা ও তাহার সমাধানের যে ইঙ্গিত এখানে করিলাম, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গুলির অন্তর্নিহিত সেই কবিদৃষ্টির অনুসরণে; ইহাই হইবে আমার আলোচনার প্রধান সূত্র। এইবার আমি বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিতে তাঁহার কবি-মানসের সেই দ্বন্দ্ব ও তাহার ক্রম-অভিব্যক্তির ধারা নিরূপণ করিব।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সহজাত মানস-প্রকৃতি ও পিপাসার বশে ঐ জীবনের মহিমায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য ও য়ুরোপীয় বিদ্যা তাঁহার সেই জীবন-জিজ্ঞাসা অধিকতর উদ্রিক্ত করিয়াছিল। তিনি তথাকার সর্ব্বশাস্ত্রে—সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে—ঐ জীবনের রহস্য ও তাহার বিরাট-গভীর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় কাব্য-উপন্যাসে তিনি সেই জীবনের রস-রূপ—দেহমনের অপূর্ব্ব লাবণ্যময় মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, হইবারই কথা। জীবনের সেই রূপ—সেই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান অবয়ব-কান্তি মিথ্যা নহে, বরং আলোছায়ার সুনিপুণ সম্পাতে তাহা অতিশয় প্রেক্ষণীয়। কিন্তু যাহা এত সুন্দর তাহার শেষ কোথায়? ঐ সৌন্দর্য্যও শুধু আর বা রস-রূপের সৌন্দর্য্য নয়; উহাতে মানব-হৃদয়ের অসীম সৌন্দর্য্য—কোথাও বিষ-নীল, কোথাও অমৃত-অরুণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ইহাও দেখিয়া-ছিলেন যে, ঐ জীবন একান্তই প্রকৃতিশাসিত। সেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের জীবন-চিত্রপটে তিনি একটি বর্ণকে অগ্নির মত জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন—তাহা সেই প্রকৃতি-শক্তি; উহাকেই মানব-জীবনের সাক্ষাৎ ও দুর্দ্ধর্ষ নিয়ন্তারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিই তাঁহার কবিশক্তিকে কুণ্ডলিনীশক্তির মতই সহসা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, উহাই তাঁহার জীবন-জিজ্ঞাসাকে কাব্যসৃষ্টির পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যগুলিতে অতঃপর সেই দ্বন্দ্ব ও তাহার বহুবিধ এবং বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করিলেই কবি-বঙ্কিম এবং ঐ দ্বন্দ্ব-সমস্যাকাতর বঙ্কিম—গল্প-রচয়িতা বঙ্কিম ও জীবন-রহস্যের গূঢ়-তত্ত্বসন্ধানী ধ্যানী বঙ্কিম, এই

দুইয়ের নিরন্তর লুকাচুরি, এবং তাহাতেই এক অসাধারণ কবি-প্রতিভাও যেমন, তেমনই কবি-জীবনেরও এক অপূর্ব্ব কাব্য স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হইতে দেখিব।)

ঐ প্রকৃতি-শক্তি পরম রহস্যময়ী, মানুষের জীবনে জয় ও পরাজয়, মৃত্যু ও অমৃত উহারই দান। বঙ্কিমচন্দ্র মেরিডিথ্ কিম্বা হার্ডির উপন্যাস সম্ভবতঃ পাঠ করেন নাই—করিলেও তিনি তাহার দ্বারা তাঁহার সেই আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতে পারিতেন না। মেরিডিথের কমেডি-তত্ত্বের প্রশংসা করিলেও, তাহাতে তিনি তাঁহার আকাঙ্‌ক্ষিত কোন সন্তোষজনক সমাধান পাইতেন না। হার্ডিকে তিনি আদৌ সহ্য করিতেন না, কারণ, হার্ডি যে প্রকৃতি-শক্তিকে অন্ধ ও অকারণে অতি-নিষ্ঠুর বলিয়া সমগ্র জীবনকেই অন্ধকার দেখিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে এমন সহজ সুবোধ্য একটা দুর্নাম দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। প্রকৃতি যদি একাত্মিকা হইত—তাহাতে কোন বিপরীত গুণের সমাবেশ না থাকিত, তবে তো কোন দ্বন্দ্ব-সংশয় থাকিত না, জীবনকেও একটা নিরবচ্ছিন্ন পাপভোগ বলিয়া যাহা হয় কোন ব্যবস্থা করা যাইত। বঙ্কিম য়ুরোপীয় সাহিত্যে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপটাই দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া সেই রূপ কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু, উহার পরে, এবং সম্ভবতঃ উহারই কারণে, ঐ প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার হিন্দু-সংস্কার পূর্ণ জাগ্রত হইয়াছিল,—সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অর্থাৎ ঐ য়ুরোপীয় দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়াই, তিনি তাহার মধ্যে অপ্রত্যক্ষকেও অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। য়ুরোপেও হিন্দুর এই শক্তি-তত্ত্ব—তাহার সেই এক হাতে বর এবং আর এক হাতে খড়্গ—এই তত্ত্বের অস্পষ্ট জ্ঞানমাত্র আছে, কিন্তু ঐ দ্বন্দ্বের নিরসন-চেষ্টা নাই। বঙ্কিম ঐ প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া একস্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তিনি ঐ য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদকে হিন্দুর ভাবনায় অধ্যাত্মবাদে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাই সমস্যা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছিল ; এখানে তাঁহার একটি প্রকৃতি-বন্দনা উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—বঙ্কিম প্রকৃতির কোন্ মায়াময় রূপ ধ্যান করিয়া মানব-জীবনের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সেই বন্দনা এইরূপ—

"তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—তুমি অশেষ ক্লেশের জননী, অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার! . . . . কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই; কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশীমায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।" [চন্দ্রশেখর]

ঐ যে 'Nature and human life' য়ুরোপীয় কাব্য-গুলির প্রধান কাব্যবস্তু—সে কি ঐ প্রকৃতির ঐ লীলা! গেটে তাঁহার 'ফাউষ্ট'-কাব্যে যে মন্ত্রে প্রকৃতির পূজা করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রকৃতিবাদ বা বৈজ্ঞানিক জীবন-দর্শন, এবং গ্রীক রূপ-রস-সাধনার সেই মানস-মুক্তি এই হিন্দু প্রকৃতিবাদের বিপরীত। সেই প্রকৃতি-শাসিত জীবনের হাহাকার ঘোচে কেমন করিয়া? কবি-বঙ্কিমের এই জিজ্ঞাসা তাঁহার কাব্যগুলিতে, উহারই উত্তরের সন্ধানে, জীবনের এই অতিথিশালার কক্ষে কক্ষে দ্বার উন্মোচন করিয়াছে। যে উত্তর তিনি মনে মনে রচনা করিয়াছেন, তাহা সত্য কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য—নরনারী-জীবনের, তথা নরনারী-চরিত্রের নানা বিগ্রহ রচনা করিয়া, তাহাদের উপরে ঐ প্রকৃতির—ঐ মহাশক্তির—ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন।

আমি বলিয়াছি য়ুরোপীয় জীবনের ইতিহাসে ও কাব্য-জগতে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রকৃতিকে নগ্নমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন; ঐ দেখা সম্পূর্ণ হইয়াছিল সেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার—সেই প্রকৃতির নেপথ্য বিধানের—তাহার সেই ভৈরবীচক্রের একমাত্র সাক্ষী, সেই প্রকৃতিরও অন্তর্য্যামী মানবায়ন-মহাকাব্যের রচয়িতা শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলবিলম্বী সেই বিশাল মায়া-দর্পণে। শেক্সপীয়ার য়ুরোপের কত দেশের কত জাতির কবিকে প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত করিয়াছেন—তাহারা সকলেই তাঁহাকে তাহাদের সেই নিজস্ব প্রকৃতি-মন্ত্রের গুরু বলিয়া বুঝিয়াছে। কিন্তু শেক্সপীয়ারের প্রকৃতি সেই আদ্যা-প্রকৃতিই বটে, সারা মর্ত্ত্যই তাহার

লীলাভূমি—য়ুরোপের বাহিরেও তাহাকে যে-কোন অপর মন্ত্রের সাধক চিনিয়া লইতে পারিবে। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই সেই জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে—এবং তাহাতে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই উপলব্ধিও তাঁহারই। মানব-জীবনঘটিত ঐ তত্ত্ব তিনি শেক্সপীয়ার হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে জিজ্ঞাসার শেষ হয় নাই, বরং মনের সেই দ্বন্দ্ব-সংশয় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার শেক্সপীয়ার-পাঠ এই অর্থে সার্থক হইয়াছিল যে, তিনি মহাকবিবর্ণিত মানব-জীবনে প্রকৃতির সেই দুরন্ত শক্তিলীলার নিরর্থকতা—সেই নিরুত্তর মহাপ্রশ্নের রহস্য-গভীরতা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়াছিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবন উহার অধিক কিছুকে মানুষের অনুভূতি-গোচর করে না, মানুষের হৃদয়-মন উহার অধিক প্রত্যক্ষ করে না—এ সত্য মানিতে হইবে ; বঙ্কিমচন্দ্র তাহা মানিয়াছিলেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পাঠক, কবি ও সমালোচকদের মত তিনি সেইখানেই—সেই দুর্জ্ঞেয়তার দ্বারদেশে বসিয়া পড়িতে রাজী হন নাই ; ঐ কঠিন সত্যের আঘাতেই তাঁহার হিন্দুসংস্কার বেশি করিয়া সাড়া দিয়াছে। যাহা দুর্জ্ঞেয়, তাহা দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই শূন্য নহে ; প্রকৃতির ঐ নির্ম্মম অন্ধলীলাই আমাদের প্রত্যক্ষ বলিয়া উহাই একমাত্র সত্য নহে, বরং বিপরীত একটা কিছুর দ্যোতনা করে বলিয়াই উহা সত্য ; অর্থাৎ, অপর extreme-এর দ্বারা এই extreme-এর সমতা করিতে হইবে, তবেই জীবনের অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা দেখিব, বঙ্কিমচন্দ্র অন্ততঃ তাঁহার উপন্যাসগুলিতে ঐ প্রকৃতির শাসনই মানিয়াছেন, অর্থাৎ শেক্সপীয়ারেই সেই দৃষ্টিরই অনুসরণ করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনিও একপ্রকার পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন ; কেবল প্রাচ্য, হিন্দু ও বাঙালী জীবনে, নরনারী চরিত্রের কয়েকটি তত্ত্ব তিনি দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছেন ; তাহাতে শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইলেও, একটু আশা,—একটু আস্তিক্য বুদ্ধির সান্ত্বনা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির রূপ-রসবিচারে এই কথা পরে সবিস্তারে বলিব ; এখন কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানস ও কাব্যপ্রেরণার এই পরিচয়মাত্র করিয়া রাখিলাম।

(২)

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভিতরে প্রবেশ করিব।

উপন্যাসকার, তথা মনুষ্যজীবনের আলেখ্য-রচয়িতার একটি বড় কৃতিত্ব—প্লট বা আখ্যানবস্তুর একটা সুসম্বদ্ধ ও সুসম্পূর্ণ রূপ। এই গল্পনির্ম্মাণশক্তিই প্রকৃত সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ—কারণ, সৃষ্টিমাত্রেই একটি অখণ্ড, সুডৌল রূপ বুঝায়। ঐ আদ্যন্তযুক্ত, সুমণ্ডলায়িত যে একটি প্লট—উহার মূলে আছে সেই 'unity of inspiration' বা কবিদৃষ্টির সমগ্রতা। এমনও বলা যাইতে পারে যে, যে উপন্যাসে এইরূপ গল্প-সম্পূর্ণতা নাই, তাহার কল্পনাও বিক্ষিপ্ত কল্পনা; তাহাতে জীবন সম্বন্ধে কতকগুলা ভাবনা, কতকগুলা খণ্ডচিত্রের যোজনা, কতকগুলা প্রশ্ন বা অমীমাংসিত সমস্যার উত্থাপন মাত্র থাকে—কবি-চিত্তে তাহার কোন সুসম্পূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয় নাই। সেই রূপটি দার্শনিক সত্য-মিথ্যা-বিচার বা একটা শেষ সিদ্ধান্তের মত হইবার প্রয়োজন নাই, যদি তাহা হয়, তবে সেই রচনা কাব্য বা একটা সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্ম্ম হইবে না, রং ও রেখার কারুকর্ম্ম হইতে পারে—জীবনেরই একটা আলেখ্য বা প্রতিকৃতি হইবে না। কিন্তু ঐরূপ সুডৌল, সুসম্বদ্ধ, সুসম্পূর্ণ আকারের মধ্যেই কবি-প্রেরণার একাগ্রতা, বলিষ্ঠতা ও সমগ্র-দৃষ্টির পরিচয় থাকে; একটা গঠিত মূর্ত্তির মতই উহার ঐ সর্ব্বাঙ্গসুষমা বা সর্ব্ব-অঙ্গ-ব্যাপী ভাবৈক-সঙ্গতিই খাঁটি সৃষ্টিকর্ম্মের লক্ষণ। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে, বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছু না হৌক, এই গল্পরচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—বোধ হয় তাঁহার অন্তরস্থ কবি-পুরুষ ঐ একটা বিষয়ে নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিল। আমরা যাহাকে রোমান্স বলি—'দুর্গেশনন্দিনী' সেইরূপ রীতিমত রোমান্সই বটে; কিন্তু তাহার পর কবি-মানসের যে অভিব্যক্তি ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ঐ খাঁটি রোমান্স-কল্পনাই অতঃপর জীবনের গভীরতম রহস্যভেদে নিযুক্ত হইয়াছে; শুধুই কাব্যকল্পনা নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মগত একটি গুরুতর পিপাসা তাহাতে যুক্ত হইয়াছে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কেবল কাব্যরসপ্রধান রোমান্স নয়—উহা উচ্চাঙ্গের কবিকর্ম্মও বটে, কাব্যের রসরূপকে

আশ্রয় করিয়া জীবনকে গভীর ও সমগ্রভাবে দেখিবার একটি দৃষ্টিও উহাতে আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জীবনের রহস্যভেদে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা প্রাণগত উৎকণ্ঠা ছিল—তাহা কেবল আর্টের দায়িত্বহীন রসবিলাস নয়। কেবলমাত্র তাঁহার কবি-কল্পনাকে পাথেয় করিয়া তিনি সেই পথে দুঃসাহসিক অভিযান করিয়াছিলেন—পথের শেষে সর্ব্বশেষ তীর্থে কোন্ সমাধান অপেক্ষা করিতেছে তাহা জানিবার জন্য তিনি সেই কল্পনাকে যতদূর সাধ্য মুক্ত রাখিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমি অতঃপর তাঁহার কবি-মানসের সেই যাত্রাপথ এই উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়াই আবিষ্কার ও অনুসরণ করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র মানব-জীবনের নিয়ন্ত্রীরূপে বিশেষভাবে প্রকৃতি-শক্তির ধ্যান করিয়াছিলেন, উহাই তাঁহার কাব্যপ্রেরণার একটি প্রধান ভাব-বীজ, আমি তাহার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহাও বলিয়াছি যে, ঐ প্রকৃতি-শক্তিকে তিনি আদৌ য়ুরোপীয় জীবনের কাব্যে ও ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; সেই দেখাই তাঁহার কবিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইহার প্রথম স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য়—'দুর্গেশনন্দিনী'র পরেই তাঁহার কবিশক্তির সেই আকস্মিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ সত্যই বিস্ময়কর। এই উপন্যাসে সেই প্রকৃতি-শক্তির একটা স্বরূপ-রূপ সেই একবার মাত্র ঝলসিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই মানব-জীবনের জবানীতে রূপায়িত করিতে গিয়া তিনি যাহা রচনা করিলেন—নামে ও ভাববস্তুতে সেই 'কপালকুণ্ডলা' একটি অসাধারণ, অনন্যসদৃশ কাব্য হইয়া আছে। তাহা পাঠ করিয়া এক ইংরেজ সমালোচক মুগ্ধ-বিস্ময়ে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

"The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the *Mariage de Loti* there is nothing comparable to the 'Kapalakundala' in the history of Western fiction."

(R. W. Fraser : *Literary History of India*)

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ঐ কল্পনার কাব্য আর রচনা করেন নাই, তার কারণ, ঐ 'mystic form of Eastern thought' জীবনের ক্ষেত্র হইতে মানুষকে দূরে লইয়া যায়; ঐ শক্তির বিরাট বিপুল রহস্যধ্যানে, জীবনের দিক দিয়াই জীবনের অর্থসন্ধান নিরর্থক হইয়া পড়ে। তথাপি উহাতেও বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের একটা তত্ত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রকৃতির সেই বিরাট স্বরূপ যদি মানুষের পক্ষে 'Natura Maligna' বা 'শ্মশান-কালী' হয়, তবে তাহার অপর মূর্ত্তি--ঐ নারী-মানবীই বটে, তাহাই—'Natura Benigna' বা সেই প্রকৃতি-শক্তির শুভদা, বরদা মূর্ত্তি। ঐ নারীশক্তির সহিত সামরস্যই পুরুষের সর্ব্বার্থসিদ্ধির উপায়। 'সামরস্য' কথাটি তন্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ; আমি সেই শব্দই ব্যবহার করিলাম, কারণ, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র সজ্ঞানে তন্ত্রের চিন্তা করেন নাই, তথাপি তাঁহার কাব্যমন্ত্র ষোলআনা তান্ত্রিক—বিস্ময়কর বলিয়াই ইহা একটা বড় কথা; কারণ, তাঁহার ঐ দৃষ্টি কোন তত্ত্বজ্ঞানপ্রসূত নয়—উহা তাঁহার কবিচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা; তাহা না হইলে উপন্যাসগুলি এমন মৌলিক কাব্য-রসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না। 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমের কবিচিত্তের সেই গভীরতর উৎকণ্ঠা একটি ক্ষুদ্র ও অতি-সরল আখ্যান অবলম্বনে, সেই ভাবেরই জয়ঘোষণা করিয়াছে। অতঃপর বঙ্কিম পুনরায় সেই গল্পকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, আবার রোমান্স-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'মৃণালিনী'র মূল গল্পটি নিরঙ্কুশ রোমান্স ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই 'মৃণালিনী'তেই কবি-বঙ্কিমের কাব্য-প্রেরণায় একটা স্পষ্ট দ্বৈধ লক্ষ্য করা যায়; একদিকে গল্প-রচনা, আর একদিকে সেই জীবন-জিজ্ঞাসা—সেই প্রকৃতি-শক্তির দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের ব্যাকুলতা, এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া কবি-কল্পনা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে, উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু সম্পূর্ণ দুইভাগে ভাগ হইয়া আছে। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর যে প্রেমকাহিনী তাহা এমনই তরল এবং লঘু, চরিত্রচিত্রণও এমন মামুলী বা অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত যে, উহার ঐ মূল কাহিনী 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে বহুগুণে নিকৃষ্ট। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, এই উপন্যাস-রচনার পূর্ব্বে কবিচিত্তে 'কপালকুণ্ডলা'র জন্ম হইয়াছে, তাই 'মৃণালিনী'তে গল্প বলিবার বাসনা যেমনই থাকুক, এবং তাহাও ঐতিহাসিক কল্পনা

ও স্বজাতি-প্রেমের প্রেরণায় যতই উদ্দীপ্ত হউক,—বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা মনোরমা-পশুপতির দাম্পত্য সঙ্কটকেই অধিকতর মহিমা দান করিয়াছে। এখানেও সেই প্রকৃতি ও পুরুষ—ওখানে পুরুষ—নবকুমার, এখানে—পশুপতি; ওখানে প্রকৃতি—কপালকুণ্ডলা, এখানে—মনোরমা। মনোরমা কপালকুণ্ডলার মত আদি-প্রকৃতিরূপিণী নয়—সে মানবীও বটে; তথাপি সে পূর্ণ মানবী নয়, প্রেমময়ী হইলেও সে দেবীর মত দূরবর্ত্তিনী—পশুপতির মত পাপদুর্ব্বল পুরুষের নিকটে আত্মসমর্পণ করে না। এই চরিত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র যে নারী-প্রকৃতির ধ্যান করিয়াছেন তাহা রহস্যময়, তাহার রূপে, তাহার বাক্যে ও আচরণে ক্ষণে ক্ষণে একটা মূল নারীস্বভাবের চকিত উদ্ভাস পশুপতিকে—সেই পাপদুর্ব্বল ভাগ্যহত পুরুষকে—মুগ্ধ ও উদ্‌ভ্রান্ত করে। পশুপতিও বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, মন্ত্রণাদক্ষতায় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়—কাম ও অর্থ এই দুইয়ের সাধনায়—পুরুষ-প্রতিভার প্রতীক; তাহার প্রেমই তাহার দুর্ব্বলতা। নারী সেই প্রেমের পূর্ণশক্তিরূপা,—সেই Natura Benigna, কিন্তু তাহার সেই বিশুদ্ধ প্রেম দুর্ব্বলের জন্য নহে। সেই প্রকৃতি অসতী নয়—সতী, তাই পশুপতির মত পুরুষের পক্ষে তাহার সেই সতীত্বই প্রাণঘাতী হইয়া উঠিল। 'কপালকুণ্ডলা'য় এই tragedy জীবনের বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে, পুরুষ-চরিত্রের জটিলতর জালের পরিবেশে, প্রবৃত্তির প্রবলতর আক্ষেপে সংঘটিত হয় নাই; এখানে সেই পুরুষ-প্রকৃতিঘটিত সমস্যা জীবনের জবানীতে আরও বৃহৎ, আরও সন্নিহিত হইয়া উঠিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'মৃণালিনী' পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসের বিকাশ ও কাব্যের আকারে তাহার অভিব্যক্তি আমি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এই কয়খানি কাব্যে যে মনোজগৎ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্কিমের কবিকল্পনা এখনও একটা দৃঢ় ভূমিকে আশ্রয় করে নাই, একটা বিশাল প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে; সেই প্রান্তরের উর্দ্ধস্থ আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, তাহাতে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ-বিলসন হইতেছে, এবং সেই বিদ্যুদ্দীপ্ত প্রান্তরে কবির দৃষ্টি দূর দিকপ্রান্তে একটা পুরীপ্রাকারের আভাস পাইতেছে।

(৩)

১৮৭৩ হইতে ১৮৭৮—এই পাঁচ বৎসরই বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার মধ্যাহ্নকাল; এই কালে তিনি যে চারিখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার কবিচিত্তের পরমোৎকর্ষও যেমন, তেমনই সেই জীবন-জিজ্ঞাসার একটা দিক-পরিবর্ত্তনও দেখা দিয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' তাঁহার কবি-প্রতিভা কথাশিল্পকে একটা মৌলিক রসরূপে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি ইহার উপরে উঠিতে পারে নাই। 'চন্দ্রশেখরে' রোমাণ্টিক কল্পনার চরম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, দেহের অপরিমেয় ক্ষুধা ও আত্মার আত্মাভিমান—দুই-ই এক উদাত্ত-করুণ বিলাপ-ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়িয়াছে। এই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে তাঁহার কবিদের পরাকাষ্ঠা আছে—ভাব-কল্পনার অমিত পরাক্রমে তিনি সেই এক সমস্যার জটিল গ্রন্থি ভেদ করিবার শেষ ও চরম প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় একই কালে তিনি 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করিয়াছিলেন—একটিতে তাঁহার কবি-মানসের স্পষ্ট গতি-পরিবর্ত্তন আছে, অপরটিতে তিনি প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে পুরুষের পরাজয়কে অতি-গভীর অনুভূতি-সহযোগে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। আসল কথা, ঐকালে তাঁহার কবিশক্তিরও যেমন পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে, তেমনই তাঁহার কবি-মানসের দ্বন্দ্বও গভীর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার ফলে, তিনি দুই বিপরীত প্রেরণার মধ্যে দোল খাইয়াছেন; জীবন-কাব্য ও জীবন-জিজ্ঞাসা,—এই দুই-ই তাঁহার কল্পনা ও কবিশক্তিকে সমমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

এই চারিখানি উপন্যাসেই বঙ্কিমের কবি-জীবনের পূর্ণ পরিণতির সাক্ষ্য আছে। ইহার পর, তাঁহার কবিশক্তি প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সজীব ছিল বটে,—'রাজসিংহ' তাহার প্রমাণ; কিন্তু আখ্যানে, চরিত্রসৃষ্টিতে ও কাব্যকল্পনার অবারিত উৎসারে—এইগুলিই তাঁহার সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ-নিদর্শন। এই পাঁচ বৎসরের কবি-জীবনে তাঁহার কবি-মানসের অস্থিরতা বা দ্রুত ভাব-পরিবর্ত্তনও লক্ষণীয়; তাহা এমনই যে, ঐ চারিখানি উপন্যাসকে সেই কবি-মানসের ক্রমোন্নত সোপানপরম্পরা বলিয়া নিশ্চিত হওয়া যায় না; 'বিষবৃক্ষে'র পর 'চন্দ্রশেখর',

'চন্দ্রশেখরে'র পর 'রজনী', এবং সর্ব্বশেষে 'কৃষ্ণকান্ত',—ইহাদের মধ্যে কোন সরল পথরেখা আবিষ্কার করা যায় না। 'বিষবৃক্ষে' সেই রোমান্সকেই সমাজ-সংসারের বাস্তবে বাঁধিয়া বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি আত্মস্থ বা রসদৃষ্টির সার্থকতায় আশ্বস্ত হইয়াছে; 'চন্দ্রশেখরে' ঘর-সংসারের বাহিরে—নদীবক্ষে ও নদীতীরে, পর্ব্বতে প্রান্তরে ও রণশিবিরে—সেই রোমান্স পুরুষ-জীবনের ট্র্যাজেডিকে দূর দিক্‌বলয়স্পর্শী করিয়াছে, জীবনের বাস্তবকে জীবনের ঊর্দ্ধে একটা অবাস্তব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। এখানে সেই দৃষ্টি আর একটা কিছুর সন্ধান করিয়াছে—গৃহ-সমাজবেষ্টিত জীবনের সুখ-দুঃখকেই একান্ত করিয়া দেখে নাই। এখানেও সেই নারীর প্রেম পুরুষের পিপাসা উদ্রেক করে—সেই প্রেমের অমৃতপাত্র পুরুষের ওষ্ঠে উঠিয়াই অদৃষ্টের পরিহাসে চূর্ণ হইয়া যায়। সেই হাহাকার এখানেও আছে বটে, কিন্তু কবির দৃষ্টি যেন সেই কারণেই পুরুষকে ঐ অদৃষ্টের উপরেও জয়ী হইতে দেখিবে; অদৃষ্টের ছলনা, প্রকৃতির ষড়যন্ত্র, এবং সংসার-সমাজের নীতি-নিয়মকে তুচ্ছ করিয়া সে তাহার আত্মার জয়ঘোষণা করিবে। 'বিষবৃক্ষ' ও 'চন্দ্রশেখরে' ভাবগত ব্যবধান অল্প নহে, একটা হইতে অপরে আরোহণের সোপান নাই। রচনাকালেরও ব্যবধান নাই বলিলেই হয়, কবি যেন একই কালে তাঁহার জিজ্ঞাসার সমাধানে দৃষ্টির দ্রুত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। এখন এই চারিখানি উপন্যাসের কাব্যবস্তু ও কবিপ্রেরণার একটু সবিশেষ পরিচয় দিব, তাহাতে কালানুক্রম থাকিবে না—থাকিবার প্রয়োজন নাই, কারণ, ঐ চারিখানিতে কবি-মানসের দ্বন্দ্ব চারিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—যেন একটা আবর্ত্তে ঘুরিতেছে—সম্মুখেও যেমন, পশ্চাতেও তেমনই; আমিও তাহার সুযোগ লইব।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পরে যেমন 'কপালকুণ্ডলা'—'মৃণালিনী'র পরে ঠিক তেমনই 'বিষবৃক্ষ'; এ যেন অবলীলাক্রমে এক একটা বড় নদীর এক পার হইতে অপর পারে উত্তরণ। প্রতিভার এমন দ্রুত পরিণতি-লাভ, কবিশক্তির এমন ক্রমান্বয় ও অবিচলিত সম্মুখগতি—এমন দীর্ঘ অথচ সুদৃঢ় পদক্ষেপ সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। এই উপন্যাসের প্লট-রচনাও যেমন অনবদ্য, তেমনই সেই রোমান্টিক ট্র্যাজেডিই স্বল্পতম ও সামান্যতম উপকরণে, জীবনের এক ক্ষুদ্রতম পটভূমিকায়—প্রায়

সাধারণ নরনারীকে আশ্রয় করিয়া—একটা নূতন কবিদৃষ্টির পরিচয় বহন করিতেছে। আমি এখানে ইহার কাহিনী-রচনায় কবিকল্পনার সেই প্রয়োগ-নৈপুণ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করিব না, এখানে সে অবকাশ নাই, অন্যত্র তাহা করিব; কেবল এখানে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিব। কাব্যে, উপন্যাসে জীবনের আলেখ্য রচনা করিতে হইলে,—মানুষের দেহমনঃপ্রাণের বহিরন্তর দৃষ্টিগোচর করাইতে হইলে, কেবল লিরিক বা আত্মভাবসর্ব্বস্ব কল্পনায় তাহা সম্ভব নয়; তাহাতে এপিক, নাটক ও লিরিক এই ত্রিবিধ প্রেরণার দুর্লভ সঙ্গীতি চাই, জীবনের সেই মূর্ত্তিনির্ম্মাণটাই শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম্ম। বাংলা সাহিত্যে, কি পূর্ব্বে, কি পরে, এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কোন কবির কাব্যসৃষ্টিতে সেই শক্তির পরিচয় নাই—য়ুরোপীয় সাহিত্যে তাহা যতই সুলভ হউক!

এই 'বিষবৃক্ষ'-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-কাব্য একটি অখণ্ড রসরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, অর্থাৎ, জীবনের জবানীতে তত্ত্ব ও কাব্য এক হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ, এখানে সেই নারী—সেই প্রকৃতি-শক্তি আর কপালকুণ্ডলা বা মনোরমা নয়—একেবারে পূর্ণ নারীরূপ ধারণ করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে পুরুষের চরিত্র আরও পূর্ণায়ত ও সংগ্রামশীল হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও আখ্যানবস্তুর উদ্ভাবনায় বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি এইবার এমন একটি কেন্দ্রগত ঐক্যের সন্ধান পাইয়াছে যে, ঐ দুইয়ে মিলিয়া কাব্যের গঠন যেমন নিশ্ছিদ্র, তাহার আকারও তেমনই মণ্ডলায়িত হইয়াছে। নিছক উপন্যাস-রচনার দিক দিয়া তাঁহার কবিশক্তি ইহার উপরে আর উঠে নাই—'বিষবৃক্ষ'ই বঙ্কিমী কাব্যকলার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু সেই জিজ্ঞাসার কি হইল? কবি-বঙ্কিম তাঁহার সেই তীর্থযাত্রায় কতখানি পথ অতিক্রম করিলেন? নগেন্দ্র দত্ত ও দেবেন্দ্র দত্ত দুই চরিত্রের দুই পুরুষ, একই বাসনা-বহ্নি দুইটা স্বতন্ত্র দেহবেদীতে জ্বালাইল, কিন্তু তাহাতে দগ্ধ হইল দুই নারী—একজন প্রেমে, আর একজন পিপাসার প্রবল পীড়নে, আত্মাহুতি দান করিল। পুরুষ দুইজনের একজন নিজেই জ্বলন্ত মশালের মত জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইল, আর একজন নারীর স্নেহে—একের আত্মবিসর্জনে এবং অপরের অভিমানবর্জনে

কোনরূপে দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মত বাঁচিয়া রহিল। নগেন্দ্র দত্তের মত এমন নারীশক্তির আশ্রিত সেণ্টিমেণ্টাল কাপুরুষ কোন য়ুরোপীয় নাটকের নায়ক হইতে পারিত না। প্রকৃতির সহিত পুরুষের দ্বন্দ্বে এখানেও তিনি পুরুষের দুর্ব্বলতাই দেখিয়াছেন। কিন্তু নারীর মধ্যে সেই প্রকৃতি-শক্তির যে বিভিন্ন রূপবিকাশ দেখাইয়াছেন তাহার কোনটা দুর্ব্বল বা মহিমাহীন নয়। যে মায়া পুরুষকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় ভ্রাম্যমাণ করে—তাহা একদিকে যেমন তাহার শক্তিহরণ করে, তেমনই অপরদিকে নিজেকেই পুরুষের সেই প্রবৃত্তিবহ্নির আহুতি করিয়া আত্মবিসর্জন করে,—এ রহস্য পরম রহস্যই বটে। যে দুর্ব্বল, সে-ই ঐ প্রকৃতিকে খুঁচাইয়া তাহার শক্তিকে আরও জাগাইয়া, জীয়াইয়া তোলে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ভাষায়—ঐ শক্তি "অশেষ ক্লেশের জননী আবার সর্ব্বসুখের আকর, সকল কামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী"—কাহার পাত্রে বিষ, কাহার পাত্রে অমৃত ঢালিয়া দিবে, তাহার স্থিরতা নাই; অতিবড় যে সেও বিষপান করিতে বাধ্য হয়, আবার অধমের ভাগ্যেও অমৃত উঠিতে পারে। এই শেষের তত্ত্বটিই সকল যুক্তিবিচার, সকল আশা-বিশ্বাসের বাহিরে, উহারই নাম সেই অদৃষ্ট বা নিয়তি; এখানে সকল morality, সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার নিষ্ফল। কুন্দ মরিল কেন? যদি মরিবেই, তবু সেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ হীরা হয় কেন? একদিকে আত্মহারা প্রেমের অসীম নিরীহতা, অপরদিকে আত্মসচেতন অপমানিত প্রেমের ভীষণ নৃশংসতা—ঘটনার চক্র বা কার্য্য-কারণের অবিচ্ছেদ্য নিয়মে উহারা কিরূপ মুখামুখী দাঁড়াইয়াছে। ঐ দুইয়ের যে প্রকৃতিগত বৈষম্য তাহাই যেন এই ট্র্যাজেডির সাক্ষাৎ কারণ; আখ্যানের ঘটনাচক্র সেই তত্ত্বকে কিরূপ চাক্ষুষ করিয়া তুলিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম এই আখ্যানের পরিকল্পনায় যে একটি সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য আছে—ঘটনার গ্রন্থিপরম্পরায়, চরিত্রের স্বতন্ত্র স্ফূর্ত্তি ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়, এবং ঐ রহস্যময় নিয়তির লীলায়,—এমন আর বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসে নাই। ইহাতে একটি ঘটনা, একটি চরিত্র, একটি বাক্যও কম বা বেশি নাই; এই "economy of means" বঙ্কিমের সকল উপন্যাসেরই বিশিষ্ট গুণ হইলেও, 'বিষবৃক্ষে' ইহার চূড়ান্ত হইয়াছে।

যেহেতু, 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানস ও কবি-কল্পনার একটি পরিপক্ব ফল, অতএব, আরেকবার ইহার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুরুষ-চরিত্র এখনও গৌণ হইয়া আছে—নারী, প্রেম ও নিয়তি এই তিনটিই মুখ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয়, প্রথম হইতেই, অর্থাৎ তাঁহার কবি-জীবনের আরম্ভেই, প্রেমকে সকল বিষের বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিয়াছিলেন। এই প্রেম কি, ইহার বিশুদ্ধ রূপ কি, তাহার ব্যাখ্যানে প্রায় সকল উপন্যাসেই তিনি কত বার কত কথাই বলিয়াছেন—শেষ পর্য্যন্ত তিনি উহাকেই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন ও শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। 'মৃণালিনী'-উপন্যাসের একস্থানে মনোরমা বলিতেছে—

"তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের মুখে তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সম্বরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ, ইহা জগদীশ্বর-পাদ-পদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়জটাবিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ, সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়।"

ইহা বঙ্কিমেরই কথা, এমন অনেক কথা—নিজের কথা—তিনি তাঁহার উপন্যাসের বহুস্থানে বলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার আত্মগত ধর্ম্মমন্ত্র। ঐ ধর্ম্মমন্ত্র ধরিয়া তিনি বহু তত্ত্ববিচার তাঁহার প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীতে করিয়াছেন। ঐ প্রেমের আদর্শ যেমন উচ্চ—উপন্যাসগুলিতে জীবনের বাস্তবের সহিত তাহার দ্বন্দ্বও তেমনই ভীষণ। সেই দ্বন্দ্ব—উপন্যাসের নায়ক-জীবনের দ্বন্দ্বই নয়, তাঁহার কবি-হৃদয়ের দ্বন্দ্বও কাব্যগুলিতে একটি অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার করিয়াছে। 'বিষবৃক্ষে'ই তাহার প্রথম প্রকৃষ্ট প্রকাশ, এবং সেই কারণেই এই উপন্যাস এমন ঘনঘোর ট্র্যাজেডির মেঘে মেদুর হইয়া উঠিয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' প্রেমের যে রূপবিকাশ আছে, তাহা তিনজন নারীকে আশ্রয় করিয়া। এই তিনই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রেমারতির দীপশিখাকে তিনদিকে হেলাইয়াছে।

একটি তাঁহার সেই স্বপ্নরচিত প্রেম-প্রতিমা ; কুন্দনন্দিনী আয়েষারই নব সংস্করণ—সেই আদর্শ প্রেমের পরা-শক্তি; কবির সেই মানসী-প্রেমকে এমন পেলব-কোমল, অথচ এমন আত্মসমাহিত—অসীম হৃদয়-বলের অধিকারিণীরূপে, আর কোন কাব্যে রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিতে দেখি নাই; বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে ইহা অতুলনীয়। কুন্দের মৃত্যুকালীন সেই রূপ—তাহার সেই বিষনীল অধরপুটের অন্তিম হাসিরেখা বাস্তবতর বাস্তব বলিয়া মনে হইলেও তাহা কবিত্বের পরাকাষ্ঠা ; শেক্সপীয়ারের নায়িকা—মরণাহত ডেসডিমোনাও বোধ হয় এমন হাসি হাসিতে পারে নাই। প্রেমের সেই আত্মবিসর্জনের মধ্যে নারীর যে অসীম শক্তি—অতখানি কোমলের মধ্যেও ঐ কঠিন আত্মস্থতা—উহাই ছিল বঙ্কিমের ধ্যান-কল্পনার ইষ্টমূর্ত্তি। আরও দেখা যায় যে, ঐরূপ প্রেম নারী-প্রকৃতিতেই সম্ভব, পুরুষ-প্রকৃতিতে নয়। পরে দেখিব, পুরুষের প্রকৃতিতে পুরুষধর্ম্মেরই উপযোগী করিয়া তিনি এই আত্মজয়ী. অথচ পূর্ণ-হৃদয় প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে এই প্রেম নয়। অতএব নারী ও প্রেম—এই দুইটি নাম অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিল। ঐ প্রেমকে শিবজটানির্গলিত পবিত্র ভাগীরথী-ধারা বলিয়া ভারতীয় আদর্শে শোধন করিয়া লওয়াই উচিত বটে; কিন্তু আসলে, উহার সাক্ষাৎ প্রেরণা আসিয়াছে য়ুরোপীয় কাব্য হইতে—উহা ভারতের সেই আধ্যাত্মিক বা পুরুষতান্ত্রিক প্রেম নয়, উহা প্রকৃতিতান্ত্রিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র কাব্যপ্রেরণার মূলে ঐ প্রেমতত্ত্বই যেমন প্রবল ও প্রধান হইয়া আছে, তেমনই উহাকে লইয়াই বা উহাকে সর্ব্বস্ব করিতে গিয়াই, তাঁহার কবি-হৃদয়ের আর এক দ্বন্দ্ব শেষ পর্য্যন্ত প্রশমিত হয় নাই। তাঁহার সেই জীবন-জিজ্ঞাসার একমাত্র সমাধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ঐ প্রেম ; পুরুষকে ঐ নারীপ্রেমের মূল্য দিতে হইবে—সেই মূল্যই পুরুষের বিশুদ্ধতম পৌরুষ। বঙ্কিম অতঃপর কতরূপে ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ প্রেমে নারীর সহিত পুরুষের সামরস্য সাধন করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়াছিলেন, য়ুরোপের প্রকৃতিবাদকে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সহিত মিলাইতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; সেই 'high speculations'

শেষে তাঁহার কবিশক্তিকেও পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, পরে তাহা দেখিব।

কিন্তু 'বিষবৃক্ষ'-উপন্যাসের ভাববস্তু কেবল উহাই নয়—পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই এক অগ্নি তিন শিখায় জ্বলিয়াছে—কুন্দ, সূর্য্যমুখী ও হীরা। এক্ষণে হীরার কথা বলিব। আমার মনে হয়, 'বিষবৃক্ষ'-উপন্যাসে বঙ্কিমের শুধু কবিশক্তিই নয়, তাঁহার কবিদৃষ্টি অতিগভীরে পৌঁছিয়াছে এই নারী-চরিত্র-সৃষ্টিতে। তাঁহার কবিপ্রাণের মমতাময় মোমের পুত্তলী যেমন কুন্দনন্দিনী, তেমনই এই নারীমূর্ত্তিটির গঠনে বঙ্কিম যে উপাদান-মৃত্তিকা আহরণ করিয়াছেন, তাহা সেই আদি-প্রকৃতির শক্তি-মৃত্তিকা। যে দৃষ্টির সাহায্যে তিনি এই নারীর নারীত্বের —তাহার নারী-আত্মার গূঢ়তম আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন, সেই দৃষ্টি যে শেক্সপীরীয় দৃষ্টি তাহাতেও সন্দেহ নাই। দৃষ্টি শেক্সপীরীয় হইলেও, শেক্সপীয়ারও তাঁহার সেই দৃষ্টিতে নারীর এমন মূর্ত্তি কোথাও নিরীক্ষণ করেন নাই। এক লেডি ম্যাকবেথ ও ক্লিওপেট্রা ছাড়া তিনি আর কোথাও নারীর অসংবৃত নগ্ন কামনার শক্তি-মূর্ত্তি চিত্রিত করেন নাই; কিন্তু তাহাতেও আহত নারীত্বের—পদাহত প্রেমের এমন ছিন্নমস্তা-রূপ নাই; তার কারণ—নারীর ইজ্জত, তাহার সেই আত্মার আত্মসম্মানের দৃঢ়মূল সতীত্ব-সংস্কার য়ুরোপীয় নারীর নারীত্ব-সংস্কার নয়; এইজন্য নারী-আত্মার এতবড় বিদ্রোহ আর কোথাও স্বাভাবিক বা সম্ভব নয়। কিন্তু হীরার সেই বৈধব্যব্রতভঙ্গকারী যে প্রেম—যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর উৎকট লালসার মতই তাহার জীবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটাইল, সেই প্রেম কেমন? তাহা অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির মতই সকল ন্যায়-অন্যায়, হিতাহিত-বিচারকে নিমেষে উড়াইয়া দেয়। 'বিষবৃক্ষে'র ঐ অনুপম ঘটনা-সংস্থানে, এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির তাড়নায়, ঐ যে এক প্রখর বুদ্ধিমতী, আত্মশাসনপটু, গভীরহৃদয়া নারী নিজের গোপনতম মর্ম্মস্থল অনাবৃত করিয়া শেষে যেন সর্ব্বস্ব হারাইয়া, সৃষ্টিধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং সেই ধ্বংসানলের শিখার মত তাহার কেশপাশ উড়াইয়া নিজেও ধ্বংস হইয়া গেল—নারীজীবনের এমন ট্র্যাজেডি, নারীর এমন ট্র্যাজিক চরিত্র বঙ্কিম আর কোথাও এমন সহানুভূতিশীল কবিদৃষ্টিসহকারে অঙ্কিত করেন নাই।

ইহার পর, রোহিণী ও শৈবলিনীতে নারীর দেহ-প্রাণের সেই মৃত্যু-গভীর পিপাসা এমন একমুখী বা নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠে নাই,—নারীত্বের একটা মূল স্বভাব এমন অখণ্ড আকারে প্রকাশ পায় নাই।

আমি 'বিষবৃক্ষে'র এই সমালোচনায়, আমার প্রসঙ্গ হইতে কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছি—উপন্যাসের প্রেরণামূলে কবি-মানসের পরিচয় ছাড়িয়া, উহার অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার প্রয়োজন ছিল। আমার প্রতিপাদ্য এই যে, এখন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসে য়ুরোপীয় জীবনের ও কাব্যের—বিশেষ করিয়া শেক্সপীয়ারের ভাবদৃষ্টি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; অথচ বঙ্কিম-চন্দ্রের ব্যক্তি-মানস জীবনের সেই সমস্যা-সমাধানে যে একটি পরম ও চরম তত্ত্বের সন্ধানে ব্যাপৃত আছে, তাহা ক্রমেই এই য়ুরোপীয় জীবনদৃষ্টির বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিয়াছে। একদিকে ঐ প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য শাসন, অপরদিকে পুরুষ-আত্মার মুক্তি-অভিমান—এই দুইয়ের সংঘর্ষ পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও দেখা যাইবে, বঙ্কিমের কবিচিত্ত তাঁহার সেই অপর চিত্তের আদেশ কিছুতেই শিরোধার্য্য করে নাই—সেই দুইয়ের যে লুকাচুরী, তাহাই পাঠকসাধারণকে বিভ্রান্ত করে; কিন্তু একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে, বঙ্কিমের কবিচিত্তের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে যে কয়খানি উপন্যাসে, কেবল সেইগুলিতেই নহে—পরে যেগুলিতে তিনি যেন সেই অপর চিত্তের আদেশ পালন করিতেই উন্মুখ হইয়াছেন তাহাতেও, একটা স্পষ্ট জোর-জবরদস্তি আছে; কাহিনীগুলিতে যে জীবন-দর্শন আছে তাহার সহিত তাঁহার মনোগত আদর্শের সঙ্গতি নাই; শেষে যেন তাঁহার কবি-জীবনেও একটা ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে। কিন্তু সে আলোচনা পরে।

তৃতীয় বক্তৃতা

[বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক কল্পনা—‘ চন্দ্রশেখর ’ ও ‘ কৃষ্ণকান্তের উইল ’; ‘ বিষবৃক্ষ ’ ও ‘ কৃষ্ণকান্ত ’—দাম্পত্য-প্রেম ও রূপতৃষ্ণা ; ‘ কৃষ্ণকান্তে ’ রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আতিশয্য ; ‘চন্দ্রশেখরে ’ কবি-মানসের দ্বন্দ্ব—আদর্শ-বিরোধ ; ‘ রজনী ’— আত্মভাব-প্রধান ; কবিদৃষ্টির দিক-পরিবর্ত্তন ও কবিহৃদয়ের ভাবান্তর ।]

‘বিষবৃক্ষে’ দেখা গেল, ঐ নারীশক্তিই প্রবলা ; পুরুষ দুর্ব্বল, মোহগ্রস্ত। কিন্তু পুরুষের শক্তি কোথায় ?—ঐ নারী তাহার শক্তি না অশক্তি ? তাহার ঐ প্রকৃতি-পারবশ্য যদি অখণ্ডনীয় হয়, তবে ঐ প্রকৃতি—ঐ নারীই তাহার মুক্তিদাতা হয় কেমন করিয়া ? মোটের উপর নারীর ধর্ম্মে ও পুরুষের ধর্ম্মে একটা বিরোধ অনিবার্য্য—যদি দুইয়েরি আত্মাভিমান প্রবল হয় ; পুরুষের পৌরুষ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ঐ আত্মাভিমান ভিন্ন আর কিছুই নয় ; নারীর আত্মাভিমান একটা রিপু, কিন্তু পুরুষের তাহাই শক্তি। এমন শক্তিমান পুরুষেরও ঐ প্রকৃতি-পারবশ্য ঘটিবেই—তাহার পরিণাম কি ? ‘বিষবৃক্ষে’ পুরুষ ঐরূপ শক্তিমান নয় ; অতএব, উহার পর, তেমনই একজন শক্তিমান পুরুষের নিয়তি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যকল্পনায় উদিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষের ঐ দ্বন্দ্ব এবং তাহাতে প্রকৃতি-শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিমান পুরুষের সেই আত্মাভিমানের সংগ্রাম, ও শেষে জীবনকে ধ্বংস করিয়াই যে জয়লাভ—য়ুরোপীয় জীবন-দর্শনের সেই প্রকৃতিবাদ—সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নয় ; আমাদেরও একটা উচ্চতর জীবন-দর্শন আছে, তাহাতে ঐ য়ুরোপীয় দর্শনকে অনায়াসে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া সম্ভব ; জীবনে সেই তত্ত্বকে প্রয়োগ করিতে পারিলে, পুরুষের সত্যকার জয়লাভ হইবে। এমনই একটা বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসে জাগরূক ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই তত্ত্বকে তো জোর করিয়া জীবনের উপরে আরোপ করা চলিবে না, জীবনের ভিতর দিয়াই তাহাতে পৌঁছিতে

হইবে ; তজ্জন্য জীবনকে খুব গভীর করিয়া—এবং আদৌ তত্ত্ব-জ্ঞানের মনোবন্ধন-মুক্ত হইয়া দেখিতে হইবে। কবি-বঙ্কিমের সেই শক্তি ছিল, তিনি জীবনকে সেইরূপ দেখা দেখিবার জন্য তাঁহার কবি-দৃষ্টিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। উপন্যাসগুলি ভালো করিয়া পড়িলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার উপন্যাসের জীবন-রঙ্গভূমিতে, ঘটনার ধারায়, বা চরিত্রের বিকাশে, কোথাও তত্ত্বের বাধা-বন্ধন নাই ; বরং সেই তত্ত্ব বা নীতি বারবার পরাস্ত হইতেছে,—তত্ত্বের সেই নিষ্ফলতার হাহাকার কিছুতেই রুদ্ধ করা যাইতেছে না। এই সত্যটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত ; যাঁহারা অন্ততঃ তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির ঐ দ্বন্দ্ব-রস—বঙ্কিমের ব্যক্তি-মানস ও কবি-প্রাণের সেই লুকাচুরির রস—হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাঁহাদিগকে আমি ঐ কাব্যপাঠের অধিকারী বলিব না।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষকে গৌণ স্থানে বসাইয়া নারীকে তিন দিক দিয়া দেখিয়াছেন। এই নারীই হইয়াছে সেই প্রকৃতি-শক্তির প্রতীক—জীবন-নাটকের প্রধানা নায়িকা ; পুরুষের যতকিছু দুর্ব্বলতা ও পুরুষ-সুলভ আত্মপরায়ণতার শাস্তি বা শান্তিদায়িনী। সেই নারীশক্তিকে বামে ও দক্ষিণে দুইদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতঃপর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি পুরুষকে সেই শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ করিয়া তাহার বিদ্রোহের ফলাফল নির্ণয় করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'বিষবৃক্ষে'র পর আমি 'চন্দ্রশেখরে'র পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে লইব ; তার কারণ, কাব্যবস্তুর দিক দিয়া ঐ দুইখানিকে পাশাপাশি ধরিয়া দেখিলে তত্ত্ববিচারের একটু সুবিধা হয়, তাই আমি ক্রমভঙ্গ করিতেছি। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও পুরুষের জীবনের পট-ভূমিকায় সেই দৈব বা নিয়তি—'Life's little Ironies'—উইলরূপী একটা দুষ্টগ্রহের ষড়যন্ত্রে যেমন অমোঘ হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই, বহির্জীবনের অদৃশ্য জাল-বন্ধনে জড়িত পুরুষ তাহার অন্তর্জীবনেও আর এক নিয়তির—প্রবৃত্তিরূপা প্রকৃতির—অতর্কিত আক্রমণে ধরাশায়ী হইয়াছে। এখানে নারীর সেই মোহিনী ও কল্যাণী—দুই মূর্ত্তিই তাহার পক্ষে একই, দুই-ই তাহার আত্মম্ভরিতার

শাস্তিদায়িনী। গোবিন্দলালের কুন্দ নাই, সূর্য্যমুখী নাই ; কেহ তাহাকে ক্ষমা করিবে না, অথবা তাহার সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য কেহ হাসিমুখে বিষপান করিবে না। তথাপি, রোহিণীর চরিত্রও যেমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে অর্দ্ধপথেই হত্যা করা হইয়াছে, তেমনই ভ্রমরও পূর্ণবিকশিতা নারী নয়—তেজস্বিনী বালিকা মাত্র ; তেমন নারী পাপে-তাপে, সংশয়-সঙ্কটে, হৃদয়দুর্ব্বল পুরুষের সহধর্ম্মিণী বা সহায়স্বরূপিণী হইবার যোগ্যা নহে। তাহার হৃদয়ের সেই অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাস—স্বামীকে মানুষ না হইয়া দেবতা হইতে হইবে, এই যে তাহার দাবী, ইহাই ঐ ট্র্যাজেডির একটা বড় কারণ হইয়াছে। অতএব এই উপন্যাসে পুরুষের জীবন দুইদিকেই একটা অতিস্থূল ও রূঢ় ধাক্কায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ; তাহাকে সেই আদি প্রকৃতি-শক্তির বা গভীরতর আত্মিক সংঘাতের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। এইজন্যই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির আদর্শে কল্পিত হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত তাহা একটা করুণরসাত্মক মেলোড্রামায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী'র পরে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় ঐ যে দাম্পত্য-প্রেমকেই মহীয়ান করিতে গিয়াছেন, তাহাতে পত্নীর প্রতি বিশ্বাসঘাতী এক পুরুষের রূপতৃষ্ণাকেই একমাত্র হেতু করিয়া, তাহার পৌরুষের চরম দুর্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার কবিদৃষ্টিও যেমন সঙ্কুচিত হইয়াছে, তেমনই সেই ট্র্যাজেডিকে বড় সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, উহার যেটুকু প্রসার বা জটিলতার সম্ভাবনা ছিল, রোহিণী-চরিত্রটিকে নিষ্পেষিত করায় তাহা নষ্ট হইয়াছে। প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের তো কথাই নাই, নগেন্দ্র দত্তের জীবনেও যে ট্র্যাজেডির ছায়া পড়িয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ সেই প্রকৃতি-শক্তির লীলা নারী-হৃদয়-মহিমাকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ-জীবনের নিয়তি-কুটিল, রহস্য-গভীর রূপকে বৃহত্তর করিয়াছে ; এখানে নারীর সেই স্বভাব-শক্তির মহিমা—কুন্দ বা হীরা—এমন কি সূর্য্যমুখীর মত চরিত্রেও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই ; ইহার একমাত্র কারণ, ঐ দাম্পত্য-নীতির প্রতি কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের পক্ষপাত। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই দাম্পত্য-জীবনের গৌরব-কীর্ত্তন-বাসনা যেন একটু জিদ্ করিয়াই এই শেষবার চরিতার্থ করিয়াছেন ; কিন্তু বাসনা চরিতার্থ হইলেও তাঁহার কবি-কল্পনা স্পষ্টই হার মানিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী'তে সেই স্বপ্ন বাধা পাইয়াছিল—এ যেন তাহারই প্রতিক্রিয়া। প্রতাপ ও অমরনাথ ঐ দাম্পত্যের আদর্শকে পুরুষ-জীবনের নিঃশ্রেয়সরূপে বরণ করিবার পক্ষে দুই দিক দিয়া সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই 'বিষবৃক্ষে'র সেই ট্র্যাজেডিকে আরও বড় করিয়া দেখাইবার জন্য বঙ্কিম নগেন্দ্র দত্ত অপেক্ষা প্রবলতর হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন এক পুরুষকে রূপতৃষ্ণায় বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মত ভস্মীভূত করিয়াছেন; এবং দম্পতি-ধর্ম্মের আদর্শরূপিণী নায়িকাকেও মহীয়সী করিতে গিয়া আত্মাভিমানের বিষে তাহাকে আত্মঘাতিনী করিয়াছেন। এই দম্পতির দুইজনেই অন্ধ, প্রেমের তিতিক্ষা বা সহমর্ম্মিতা কাহারও নাই; ফলে এই উপন্যাসে, জীবনের ক্ষেত্রও যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনই তাহাতে সেই প্রেমের নিষ্ফলতার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদই আছে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে, আমরা কবি-বঙ্কিমের মুক্ত-স্বাধীন কল্পনার যে দৃপ্ত বিচরণ দেখি, দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি তাহা সম্বরণ করিয়াছেন; তাহাতে গল্পরচনাই আছে, কবি-কল্পনার সেই স্ফূর্ত্তি আর নাই। তথাপি এখানেও সেই নারীই পুরুষকে সাক্ষাৎভাবে কামনার ঋণজালে জড়াইয়াছে; সেই জাল সে কাপুরুষের মতই ছিন্ন করিল। রোহিণীকে যে ঐরূপে সরাইয়া দিতে হইল, তাহাতে প্রমাণ হয়, চরিত্র অপেক্ষা ঘটনা, প্লট অপেক্ষা পরিণামই মুখ্য হইয়াছে, এবং সেই পরিণামের পক্ষে রোহিণীর মত চরিত্র একটা বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ উপন্যাসের প্লট প্রথম হইতেই সুকল্পিত হয় নাই, সে বিষয়ে 'বিষবৃক্ষের' সহিত ইহার তুলনাই হয় না।

এখন ঐ পুরুষ—ঐ গোবিন্দলালের দিকে আমাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে হইবে। টাইফয়েড রোগ নাকি বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে সাংঘাতিক—সে রোগ যুবকের সেই যুবাশক্তিকেই নিজ শক্তিতে পরিণত করিয়া রোগীর প্রাণহরণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে সেই পূর্ণ যৌবন-শক্তির অধিকারী করিয়া তাহাতে ঐ রূপতৃষ্ণার টাইফয়েড ধরাইয়া দিয়াছেন—এবং তাহার দেহে ঐ বিষের ক্রিয়া স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এক নারী সেই রোগের বীজাণু বহিয়া আনিল—আর এক নারী সেই বিষের বিষ-চিকিৎসাই করিল; তাহার প্রেমের দুর্দ্দমনীয় অভিমান ঐ রোগীর পক্ষে আরও নিদারুণ হইয়া উঠিল। একদিকে

কামনার অগ্নিস্ফুরণ, অপরদিকে সেই অগ্নিকে পায়ের তলায় দলিয়া তাহার নির্ব্বাপণ চেষ্টা—সমর্থ-স্নেহের বারিবর্ষণ তাহাতে নাই; পুরুষ স্বকর্ম্মফলভুক্ হইয়া কোথাও আশ্রয় পাইল না। এই উপন্যাসে নারীর যে অপরা-মূর্ত্তি আছে, তাহা বড় কঠোর—সেই কঠোরতা spiritual নয়—moral; তাহাতে প্রেমাস্পদের কল্যাণ-কামনা অপেক্ষা আত্মমর্য্যাদা বা আত্মধর্ম্মের শুচিতা-রক্ষার কামনাই অধিক। এ প্রেম মূলে আত্মপ্রেম। তথাপি, বালিকার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, কারণ, তখনও তাহার হৃদয়ের পূর্ণ জাগরণ হয় নাই; কিন্তু পূর্ণবয়স্কার পক্ষে ইহাই আধুনিক প্রেম—অতিশয় বুদ্ধিসঙ্গত, নিজ অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। এখানেও ঐ ভ্রমর-চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নারী-চরিত্রজ্ঞানের—সেই সুগভীর কবিদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন; দাম্পত্য-নীতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাত যেমনই হৌক, এবং ট্র্যাজেডি যে স্তরের ট্র্যাজেডিই হৌক, ঐ অভিমান ঐ চরিত্রের পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক; গোবিন্দলালও তাহার বালিকা পত্নীর সরলতা ও অতি-বিশ্বাসকে পরম স্নেহে লালন করিয়াছিল—তাহার সেই মুগ্ধস্বভাবকে প্রশ্রয় দিয়াছিল; তাহাতেই সে নিজের গুরুতর আত্মিক-সঙ্কটে, তাহার পুরুষ-চরিত্রে প্রচ্ছন্ন সেই দুর্ব্বার ব্যাধির আক্রমণে, ঐ পত্নীর নিকটে কোন সহানুভূতি বা সময়োচিত সেবা-শুশ্রূষা লাভ করিল না, কারণ ভ্রমর সূর্য্যমুখী হইতে পারে না। শেষে সেই সর্ব্বহারা শ্মশানভস্মভূষিতদেহ পুরুষ সংসার হইতে দূরে, একটা প্রলয়াবশেষ দগ্ধগ্রহের মত দিগন্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

কৃষ্ণকান্তের উইলে'র যে সমালোচনা আমি এখানে করিলাম, তাহা হয়তো ঠিক হইল না; অনেকের মতে এই উপন্যাসই বঙ্কিম-চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—এমন কি, বঙ্কিমের নিজের মতও নাকি তাহাই ছিল। আমি নিজেও এককালে এই উপন্যাসকে—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস না হইলেও, তাঁহার কবিশক্তির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করিতাম। এক হিসাবে তাহা সত্য। যদি বলা যায়, এই উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেক্সপীরীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও, ঠিক সেই কারণেই ইহার কাব্য-প্রেরণা পীড়িত হইয়া এমন মেলোড্রামার সৃষ্টি করিয়াছে।

গোবিন্দলালের রোহিণী-হত্যা যেমন, তেমনই তাহার সেই সন্ন্যাসিবেশে পুনরাবির্ভাব এবং সেই উক্তি একই চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও, উহাতে শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির স্পষ্ট অনুভাবনা আছে বলিয়াই এমন রসাভাস ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই গোবিন্দলালকে তেমনই একটা ট্র্যাজিক চরিত্ররূপে খাড়া করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু য়ুরোপীয় জীবনে যাহা সম্ভব, ভারতীয় এবং বিশেষ করিয়া বাঙালী-জীবনে ও -চরিত্রে তাহা আদৌ সম্ভব নহে; এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ট্র্যাজেডির ভাব-গ্রন্থি অন্যরূপ, পরে সে আলোচনা করিব। বঙ্কিমের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ইহাই যে, তিনি কল্পনার আতিশয্যে বাস্তবকে কোথাও লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, তাই শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির আদর্শে বাংলা কাব্য রচনা করিতে গিয়াও বাঙালী-জীবন ও বাঙালী-চরিত্রের সত্যকে লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। তথাপি, হয়তো ইহাই মনে করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়াছিলেন যে, বাঙালী-জীবনের ট্র্যাজেডি ইহা অপেক্ষা ভীষণতর হইতে পারে না। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, গোবিন্দলালের ঐ রূপতৃষ্ণা একটা রিপুমাত্র; উহা আত্মার আর্তি নয়, একটা অতিস্থূল প্রবৃত্তি; সেই প্রবৃত্তির নিকটে সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে—যেন অবশে তলাইয়া গিয়াছে; সে যেন একটা মূর্চ্ছিত অবস্থা, তাহাতে প্রবৃত্তির মাদকতা আছে—তেজস্বিতা নাই; উহা ট্র্যাজিক চরিত্রের লক্ষণ নয়, কারণ, ঐরূপ নিছক রিপুপারবশ্য কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। গোবিন্দলাল শেষে যে আত্মলাভের জয়-ঘোষণা করিয়াছে, তাহাও জীবনের দিক দিয়া পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়—এমন কি, ঐরূপ ঘোষণা তাহার সেই পরাজয়কেই আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অতএব, এই উপন্যাসে শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির স্পষ্ট অনুভাবনা থাকিলেও, ইহাতে শক্তি অপেক্ষা অশক্তির প্রকাশই অধিক দেখা যায়, এবং সেই কারণে তাহা ট্র্যাজেডি হইতে গিয়াও করুণরসাত্মক কাব্য হইয়া রসাভাস ঘটাইয়াছে।

(২)

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুরুষের জীবন-রহস্য বা নিয়তির কঠিন বন্ধন—পুরুষের উপরে প্রকৃতির সেই দুর্লঙ্ঘ্য শাসন—সৃষ্টির একটা

অমোঘ নীতি বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানিয়া লইয়াছিলেন; এই প্রকৃতিবাদই জীবনবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; ইহার প্রত্যক্ষ-প্রেরণা আসিয়াছিল য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে, পরোক্ষ-চেতনা নিহিত ছিল তাঁহার বাঙালী-সুলভ রক্তগত তান্ত্রিক সংস্কারে। ঐ প্রকৃতির শাসন, বা তাহার হস্তে সেই পরাজয়ের প্রতিষেধকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র একটা বস্তুকে—দেহ-আত্মার, প্রকৃতি-পুরুষের মিলন সেতু বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রেম। এই প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারী; তাহার সেই শক্তি পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক; অতএব, ঐ প্রেমের বশ্যতা-স্বীকার পুরুষের পক্ষে যেমন অগৌরব নহে, তেমনই তাহাতেই প্রকৃতিরূপা সেই নারীশক্তির যতকিছু বিরুদ্ধতা দূর করিয়া তাহাকে কল্যাণময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, শুভদা বরদা করিয়া তোলা সম্ভব—সেই পথেই পুরুষের নিঃশ্রেয়স লাভ হইবে; ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ক্রমপরিস্ফুট হইয়াছিল। আমাদের তন্ত্রও এই কথাই বলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি নারীর ধর্ম্ম ও পুরুষের ধর্ম্মে এমন একটা মূলগত বৈষম্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, অতঃপর নারী-পুরুষের প্রেম-সম্পর্ককে একটা কঠিনতর আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার জীবনবাদকে সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। এই পরবর্ত্তী আদর্শের ছায়া 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কবি-চিত্ত যেরূপ আলোড়িত হইয়াছে, এমন আর কোথাও নয়। এই 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসে তিনি সেই য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদকে যেমন প্রশ্রয় দিয়াছেন—প্রকৃতি ও পুরুষের সেই দ্বন্দ্বকে কাব্যকল্পনার মহৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন, তেমনই অপর দিকে, সেই কাব্যমহিমা হইতে মুক্ত, অপেক্ষাকৃত চিত্তাকর্ষণহীন অপর একটি আদর্শকে মনের নিভৃত-নির্জনে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার উৎকণ্ঠাক্লিষ্ট মন সেই আদর্শের পূজা করিতে চাহিয়াছে বটে, তথাপি তাঁহার কবি-প্রাণ সেই শান্তি অপেক্ষা সংগ্রাম, ও সংগ্রামে জয়লাভের যে পৌরুষ, তাহারই উচ্ছ্বসিত জয়গান করিয়া, তাঁহার কবি-জীবন ও জীবন-কাব্য-রচনার একটা বড় অধ্যায় শেষ করিয়াছে।

ঐ যে দুই আদর্শের কথা বলিয়াছি, 'চন্দ্রশেখরে' কবি-মানসের সেই দুই আদর্শের দ্বন্দ্ব অতিশয় লক্ষণীয়। একদিকে হোমার,

শেক্সপীয়ার—অপরদিকে ব্যাস-বাল্মীকি ; একদিকে পুরুষের রাজসিক আত্মাভিমান—প্রতাপের সেই আত্মজয়ের দুর্দ্ধর্ষ বীরপনা ; অপর-দিকে, সাত্ত্বিক আত্মস্থতার নিরভিমান মহত্ব—চন্দ্রশেখরের কীর্ত্তিহীন, বীরত্বহীন অবিক্ষুব্ধ পৌরুষ। এই দুই আদর্শের কোন্‌টি মহত্তর, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা নিজে ঐ কাহিনীতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন নাই, বরং শৈবলিনীর পতি নয়—প্রণয়ীই নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং তাহাতে রোমান্সের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে ; এ কাহিনীর যতকিছু কাব্যরস প্রতাপ ও শৈবলিনীকে ঘিরিয়া অতলস্পর্শী হইয়াছে। কিন্তু তবু উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে—'চন্দ্রশেখরে'র নামে। বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি ও সমালোচক, সে সমালোচনা উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তির সহগামী; তাহারই রশ্মিপাতে কবির কল্পনা পথভ্রষ্ট হয় না। অতএব উপন্যাসের ঐ নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। গ্রন্থমধ্যে তিনি পাঠকের বুদ্ধিভেদ করেন নাই—সম্ভবতঃ নিজের প্রবল-গভীর কাব্যরসাবেশও তাহার জন্য দায়ী। অনন্তপ্রবাহিণী ভাগীরথীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল বারিরাশির মধ্যে প্রতাপ-শৈবলিনীর সেই সাঁতার সমগ্র কাব্যখানিকে ভাববন্যায় উচ্ছ্বসিত করিয়াছে। তাই, সেই কাব্য-বন্যা হইতে দূরে, পল্লীর এক নিভৃত কুটীরে, মাটির প্রদীপে, যে একটি স্থির শিখা জ্বলিতেছে, সেদিকে তাকাইবার অবকাশ আমরা পাই না। তবু এই কাব্যের নাম 'চন্দ্রশেখর'। প্রতাপ—পুরুষবীর ; চন্দ্রশেখর—জ্ঞানী, আত্মদর্শী। ঐ পুরুষবীর নারীপ্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিয়াই তাহার পুরুষাভিমান চরিতার্থ করিল—একরূপ প্লেটোনিক প্রেমের বেনামীতে সে হৃদয়-বৃত্তির দমন বা উচ্ছেদকেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া নিজ আত্মাকে আশ্বস্ত করিল। কাব্য সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপের উদ্দেশে একেবারে নিজের জবানীতেই, যে মর্ম্মবিদারক সান্ত্বনাবাণী উচচারণ করিয়াছেন, তাহাতে জীবনকে ও প্রকৃতিরূপা নারীকে একরূপ বর্জন করাই হয় ; পুরুষের জীবনে একটা মহাশূন্যই মুখব্যাদান করিয়া থাকে। সেই প্রেমকে এতখানি ঊর্দ্ধগ করিয়া তুলিতে শেক্সপীয়ারও পারিতেন কিনা সন্দেহ। একমাত্র হ্যামলেট-ওফেলিয়ার কথা মনে আসে বটে, কিন্তু সেখানে নায়কের জীবনে সমস্যাসঙ্কট আরও গভীর, আরও জটিল। য়ুরোপীয় প্রবৃত্তিধর্ম্মকেই এতখানি শোধন করিয়া

তাহা দ্বারাই প্রকৃতিকে জয় করার এই যে অত্যুচ্চ কল্পনা——এই Intrified Idealism—বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ ভিক্টর হুগোর উপন্যাসগুলি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার কারণ, উহা ছাড়া ঐ সমস্যার সমাধান আর কিছুতেই হইত না। কিন্তু উহার পরেই—কিম্বা ঐ একই সময়ে—তিনি সেই যুরোপীয় ভাব-তন্ত্র ত্যাগ করিয়া, ঐ প্রকৃতি-শক্তিকে পুরুষ হইতে পৃথক করিয়া, অন্যপথে জীবনের সেই সমস্যা সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শৈবলিনী ও প্রতাপের মধ্যে চিরবিচ্ছেদই অবশ্যম্ভাবী—নারীর ধর্ম্ম ও পুরুষের ধর্ম্ম এক নহে; একের যাহাতে নিঃশ্রেয়স, অপরের পক্ষে তাহা আত্মহত্যা মাত্র। না, নারীর শক্তি অন্যরূপ, পুরুষের শক্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র; নারীর শক্তি আত্মনিসর্জনে, পুরুষের শক্তি আত্মসম্বরণে, আত্মার আত্মজয়ে। প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয় করিয়াছিল—তাহাতেও আত্মার আর্ত্তনাদ স্তব্ধ হয় নাই। সেই আত্মাভিমানের বশে, সে ঐ নারীকে এতটুকু মমতা করে নাই। শৈবলিনীর নারী-জীবন ব্যর্থ, এমন কি, নিঃশেষে নিহত হওয়ার পর, প্রতাপের ঐ আত্মবিসর্জনে পুরুষের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে——শৈবলিনীর তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধিই আর নাই। কিন্তু আর একজনের দিকে চাহিয়া দেখ—সে স্থিতধী ও স্থিরপ্রজ্ঞ; তাহাকে প্রতাপের মত এমন যুদ্ধ করিতে হয় নাই, এমন করিয়া ইন্দ্রিয়-জয় করিতে হয় নাই। তাই বলিয়া তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র নয়,—নিস্তরঙ্গ বটে, কিন্তু গভীর। শৈবলিনী তাহার বিবাহিতা স্ত্রী—তাহার অন্তরের কাহিনী, তাহার আজন্মের সেই অপ্রতিবিধেয় নিয়তির কথা সে শুনিল; স্ত্রী অন্যপূর্ব্বা, তাহাও স্ত্রীর মুখেই জানিল; তথাপি সে তাহাকে ত্যাগ করিল না—অনন্ত ক্ষমা ও অপরিসীম করুণায় সে ঐ ভাগ্যহত, সমাজবিধি-বিড়ম্বিত, সর্ব্ব-আশাশূন্য, বিদীর্ণহৃদয়া নারীকে বুকে তুলিয়া আপন ঘরে লইয়া গেল। প্রতাপ যখন ইন্দ্রিয়-জয়ের বীরলোকে প্রয়াণ করিতেছে, তখন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সেই জ্ঞানহীন ও প্রায়-প্রাণহীন দেহটাকে যে কারণে পরিহার করিতে পারিল না—তাহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নয়, অসতী স্ত্রীর প্রতি আত্মমর্য্যাদাহীন স্বামীর হীন আসক্তি নয়; তাহা যে কি, সে কথা ঐ কাহিনীর মধ্যে উহ্য রাখিয়া কবি উপন্যাসের নামকরণে দৃঢ় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপন্যাসের নায়ক ঐ দুইজনেই—

দুই আদর্শের; একজন নায়িকা-নারীর প্রেমাস্পদ; সেই নারী নিষিদ্ধ প্রেমের অগ্নিবেষ্টনীতে আপনাকে বেড়িয়াছে, আর সেই পুরুষ তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া, ভূমিতল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া, আকাশে যোগাসন পাতিয়াছে। অপর জন—তেমন নায়ক-মহিমা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে পুরুষের নীরব জয়লাভ, এবং স্বতন্ত্র পুরুষ-মহিমার একটি স্তব্ধ-গভীর শান্ত-স্থির মূর্ত্তিরূপে সে আমাদের মুগ্ধদৃষ্টির অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে।

ইহাই কবি-বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসায় য়ুরোপীয় জীবন-দর্শন ও কবিদৃষ্টির শেষ ও শ্রেষ্ঠতম কাব্যপ্রয়াস। আমি দলনী বেগমের সেই কাহিনীর উল্লেখ করিলাম না। তার কারণ, নারী-প্রেমের ঐ একনিষ্ঠা ও আত্মবিসর্জনের চিত্র বঙ্কিমের উপন্যাসে নূতন নয়—সেখানে পুরুষের পরাজয়টাই বড় হইয়া উঠে। কিন্তু এই কাব্যে কবি পুরুষকেই জয়ী করিতে চাহিয়াছেন—কবিদৃষ্টিতে সেই জয়-পরাজয়ের সর্ব্বশেষ সাক্ষ্য তিনি 'চন্দ্রশেখর'-উপন্যাসে বিবৃত করিয়া অতঃপর—নারী ও পুরুষ এই দুইকে পৃথক করিয়া, পুরুষের নিয়তির—তাহার ধর্ম্ম ও চারিত্রিক শক্তি-অশক্তির যে ধারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কাব্যে কবিপ্রাণের সেই বসন্তোৎসব—নরনারীর হৃদয়রক্তের সেই হোরিখেলা আর নাই; কবি যেন—"Sadder but a wiser man" হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সেই মনোজীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চ্চা শেষ করিয়া, হিন্দুর চিন্তা ও ভাবজগতের আরও গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন। শেক্সপীয়ারের মত তিনি যদি বিশুদ্ধ কবিপ্রতিভার অধিকারী হইতেন—অর্থাৎ যদি এই পরিদৃশ্যমান জীবন ও জগতের অসীম রহস্যরস ছাড়া আর কিছুই তাঁহার প্রাণের পানীয় না হইত—কোন জিজ্ঞাসা না থাকিত, তবে হয়তো এত শীঘ্র তাঁহার সেই জীবনরসরসিকতার আশ্চর্য্য কবিদৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিত না। আমি বলিয়াছি, প্রেম এবং নারী এই দুইটি বঙ্কিম-কাব্যের আদি কাব্যমন্ত্র। ঐ প্রেমই জগৎসংসারের একমাত্র প্রভব ও প্রলয়স্থান, এবং নারীতেই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ; অর্থাৎ, এই জীবনে—প্রকৃতিশাসিত পুরুষ-জীবনে—নারীই সেই প্রেমশক্তির আধার; সে জীবনের জয়-পরাজয় ঐ নারীর হাতেই লাভ

করিতে হইবে। এই তত্ত্ব এদেশের তত্ত্বচিন্তায় ও ভাব-কল্পনায় নূতন না হইলেও—বঙ্কিমচন্দ্রকে ইহা যেন একটা জন্মান্তরীণ সংস্কারের মত পাইয়া বসিয়াছিল; শেষ পর্য্যন্ত ইহাই তাঁহাকে হতাশ ও জীবনের প্রতি কতকটা আস্থাহীন করিয়াছে; জীবনকে ছাড়িতেও পারেন না, আবার পুরুষ-স্বভাবের সহিত নারী-প্রকৃতির সহজ যোগস্থাপনও দুরূহ। ঐ হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে, পুরুষের প্রবৃত্তি যে-পথে চলিবে—নারীর প্রকৃতি তাহার বিপরীত; নারী যদি পুরুষকে প্রশ্রয় দেয়, তবে তাহার সর্ব্বনাশই হইবে এবং নারীও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ঐ প্রবৃত্তির—ঐ প্রেমের প্রবল হৃদয়াবেগেও নারী অতিশয় "moral"; তার কারণ, এই সৃষ্টি তো তাহারই শক্তির লীলাক্ষেত্র—তাহার নিকটে উহাই সত্য, অতএব পবিত্র; ঐ লীলা ও লীলার ক্ষেত্রকে রক্ষা করিতে হইবে, তাই প্রবুদ্ধ নারী-আত্মা প্রেমেও অতিশয় কঠিন; সে নিজেও যেমন একটা বড় মূল্য দিবে, তেমনই একটা বড় মূল্যই আদায় করিবে। কিন্তু পুরুষের যেন উহাতে একটা বৈরাগ্যই আছে—তাহার পক্ষে ঐ প্রেম একটা প্রবল মোহ, তাই ঐ প্রবৃত্তিও মূলে immoral; এইজন্যই, নারীর সহিত পুরুষের—অতিগভীর পিপাসাপরায়ণ পুরুষের—প্রেম-সম্পর্ক একটা বিরোধের সৃষ্টি করিবেই। পুরুষ যদি সেই প্রেমেও একরূপ বৈরাগ্যসাধন অথবা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করে, অর্থাৎ জীবনকে কতকটা পাশ কাটাইতে, বা নিজ স্বভাবের সঙ্কোচ করিতে না পারে, তবে তাহার ঐ নারী-সম্পর্ক বা ঐরূপ জীবনচর্য্যা অনিষ্টকর ও বিঘ্নসঙ্কুল হইবে। পুরুষ আপন ক্ষেত্রে নারীর সহযোগিতা পাইবে না; অথচ নারীর ক্ষেত্র তাহার অশক্তির ক্ষেত্র, সেখানে সে পদে পদে আত্মভ্রষ্ট হয়। 'রজনী' হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বটিকে অধিকতর বাস্তবের ভূমিতে নামাইয়া, রোমান্টিক ট্র্যাজেডির ঘনঘটা হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া, পুরুষের সেই অশক্তির বিড়ম্বনাকে এবং সংসারে নারীর সেই শক্তিময়ী মূর্ত্তিকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। 'রজনী'তে অমরনাথ ও লবঙ্গলতা, 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর, 'আনন্দমঠে' জীবানন্দ ও শান্তি—প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন অবস্থানে ও পুরুষচরিত্রভেদে সেই এক তত্ত্ব উঁকি দিয়াছে। সর্ব্বত্র পুরুষ—হয় দুর্ব্বল, নয় দায়িত্বহীন; অথবা আসক্তিহীন বৈরাগী। এই শেষের

চরিত্রলক্ষণটি পুরুষের মধ্যে ক্রমেই স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম পুরুষের পক্ষে একটা মোহ,—কিন্তু নারীর পক্ষে তাহা নয়; নারী ঐ প্রেমেই উচ্চতম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে—তাহাব প্রকৃতির পূর্ণ-বিকাশ উহাতেই হয়; কিন্তু পুরুষের পক্ষে উহা দুর্ব্বলতা, উহা প্রলোভন; ঐ নারীই তাহার শাস্তি বিধান করে। তথাপি, এই তত্ত্ব বঙ্কিমের কাব্যপ্রেরণা বা জীবন-দর্শনকে কিছুমাত্র বিচলিত করে নাই—তার কারণ, তিনি ঐ তত্ত্বকে সৃষ্টির বা মনুষ্যপ্রকৃতির অন্তর্গূঢ় নিয়ম বলিয়া তাঁহার কবিদৃষ্টিতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন; পরে সেই তত্ত্বকে স্বীকার করিয়া তিনি তাঁহার ব্যক্তি-মানসের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করিয়াছিলেন—সেই উত্তর তিনি অন্যত্রও যেমন, তেমনই এই কাব্য-গুলির ফাঁকে ফাঁকে ছড়াইয়াছেন—এবং বস্তুভেদী কল্পনায়, অর্থাৎ জীবন-সত্যের গভীরতম প্রেরণায়, যতই ঐ নারীপুরুষঘটিত জীবনের আদি-নিয়তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—সেই প্রকৃতির বুদ্ধিভ্রংশকারী চিত্তোন্মাদিনী মূর্ত্তি যতই দিকে দিকে তাঁহার দৃষ্টিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, ততই যেন মহাভয়ে স্বস্ত্যয়নমন্ত্র ও রক্ষাকবচের শরণাপন্ন হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ঐ সমস্যা ও তাহার দুশ্ছেদ্যতাই কাব্যরসকে এমন উজ্জ্বল উচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে; ইন্দ্রিয়সংযমের প্রশংসা এবং ধর্ম্মগুরুর মত নীতিকথা যে ঐ প্রবৃত্তির বাঁধ বাঁধিতে পারে না—পুরুষের অসীম দুর্গতি তদ্দ্বারা নিবারিত হয় না, ইহাই নীতি-উপদেষ্টা বঙ্কিমের সেই ধর্ম্ম-সান্ত্বনার বিরুদ্ধে——কবি-বঙ্কিমের সমগ্র জীবনব্যাপী হাহাকার। এই দ্বন্দ্বই তাঁহাকে এতবড় কবি করিয়া তুলিয়াছে—দ্বন্দ্বের ঐ এক কারণ; তিনি প্রকৃতিপন্থী—নারীশক্তির উপাসক; ঐ বৈদান্তিক অধ্যাত্মনীতি তাঁহার পৌরুষকে যতই আশ্বস্ত করুক না কেন, একটা তান্ত্রিক সংস্কার সকল আত্মাভিমান ব্যর্থ করিয়াছে।

(৩)

এইবার এইকালের তৃতীয় উপন্যাস 'রজনী'র কথা। আমি ক্রমভঙ্গ করিয়াছি; কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 'বিষবৃক্ষ',—

'চন্দ্রশেখর'—'রজনী'—'কৃষ্ণকান্ত'—রচনার কালক্রম এইরূপ। 'বিষবৃক্ষে'র পর 'চন্দ্রশেখরে' যেমন কবিকল্পনার পটপরিবর্ত্তন, তেমনই তাহার পর 'রজনী'তে রচনারীতিরও যেমন—তেমনই দৃষ্টির দিক-পরিবর্ত্তন অতিশয় লক্ষণীয়। সর্ব্বশেষে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'; সে যেন পুনরায় 'বিষবৃক্ষে'র ভাবগ্রন্থির একটা নূতনতর সংযোজনা; এদিক দিয়া 'কৃষ্ণকান্ত' 'বিষবৃক্ষে'র অনুষঙ্গী। ভ্রমর হইয়াছে সূর্য্যমুখীর একটি বিপরীত সংস্করণ, এবং বালবিধবা কুন্দের স্থানে রোহিণীর মত বিধবা সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বেশ বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ একটি বন্ধনজাল সৃষ্টি করিয়া এবার তিনি গোবিন্দলালরূপী পুরুষকে কঠিনতর পরীক্ষায় ফেলিয়া সেই এক ভাববস্তুর সত্যনির্ণয় করিতেছেন; তাই আমি 'বিষবৃক্ষে'র পরেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লইয়াছিলাম। তথাপি, এই আলোচনার ক্রমভঙ্গ ও ক্রমরক্ষা দুই-ই চলিতে পারে। এক্ষণে প্রধান দ্রষ্টব্য এই যে, কবিচিত্তে 'বিষবৃক্ষে'র পর 'চন্দ্রশেখর' যে কারণেই উদয় হইয়া থাকুক, ঐ চারিখানির কল্পনামূলে যে উৎকণ্ঠাই প্রচ্ছন্ন থাকুক,—বঙ্কিমচন্দ্রের কবিজীবনে যে একটি ভাবান্তর তাঁহার শেষ কয়খানি উপন্যাসে লক্ষিত হয়, তাহার সূচনা ঐ 'রজনী' হইতে। এই উপন্যাসের কাব্যরূপ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনই সেই কাব্যকাহিনীর অন্তরালে কবির আত্মকথা—তাঁহার ব্যক্তিহৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস যেরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে তেমন আর কোথাও নয়। ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, শেষের উপন্যাসগুলিতে দাম্পত্যপ্রেমের যে নূতনতর আদর্শ এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের যে নূতনতর ভাবনা ক্রমপরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারও অঙ্কুর এই 'রজনী'তেই আছে। এইজন্য আমি ঐ শেষস্তরের উপন্যাসগুলির মুখবন্ধ স্বরূপ 'রজনী'র আলোচনা করিতেছি। প্রথমে উহার কাহিনী ও কাব্যবস্তুর পরিচয় দিব, এবং তাহাতেও কবিমানসের কয়েকটি ভাবগ্রন্থি উন্মোচন করিব।

'রজনী'র মূল আখ্যায়িকাটি একখানি গীতিকাব্য বলিলেও হয়—Psychological, Subjective, Lyrical. কুন্দনন্দিনীর সেই লিরিক-প্রেম আর একরূপে কবিকে আবিষ্ট করিয়াছে। প্রথম হইতেই প্রেমের এক বিচিত্র ইতিহাস—প্রেমের এক অপূর্ব্ব জন্মকথা; ইহাই Psychological. কাহিনীও মিলনান্ত; কিন্তু এমন

চমৎকার গীতিকাব্যেও একটি নাটকীয় ট্র্যাজেডি লুকাইয়া আছে—সেই নিয়তির লীলা আরেক পুরুষের জীবনে আরও নিদারুণ ও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের পুষ্পমাল্য অদৃষ্টের পরিহাসের মত যাহাকে প্রলুব্ধ করিল, সে তাহা কুড়াইয়া পাইলেও, আরেক জনের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া, তাহার বঞ্চিত জীবনের সর্ব্বশেষ গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া, সংসারের দোকান-পাট তুলিয়া দিল—একার পথে যাত্রা করিল। সংসার হইতে বিদায় লইবার কালে অমরনাথ বলিতেছে—

"প্রভো, তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে নাই, জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই।......

"সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই, তবে আশার কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে?

"প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জন দিব।"

—কথাগুলি অমরনাথের বটে, কিন্তু কণ্ঠ কাহার? প্রতাপ বা গোবিন্দলাল এমন কথা বলে নাই—বলিতে পারিত না; আর কোন উপন্যাসের নায়ক কোন অবস্থায় এমন কথা বলে নাই। একমাত্র "কমলাকান্ত"রূপী বঙ্কিমের কণ্ঠে এমন কথা শোনা গিয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে এই প্রথম 'রজনী'তেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৌন এমন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কি শচীন্দ্র, কি অমরনাথ উভয়ের চরিত্রে এইরূপ subjectivity বা আত্মভাবের আরোপ আছে।

'রজনী' কাব্যহিসাবে কবিমানসের নবতন কল্পনা-বিলাস বলিয়াই মনে হইবে, তথাপি, একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে—সেই একই প্রশ্নকে কবিচিত্ত এখানে আর এক ভঙ্গিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে—এবং প্রায় একই কালে। প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর দুই প্রকারে কবি-চিত্তকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সেই প্রশ্ন অন্তর্দ্ধান করে নাই। ঐ নারী এখানেও পুরুষের জীবনে দৃঢ় আসন করিয়া বসিয়াছে; উহাকে এড়াইতে হইলে এই জীবনকেই এড়াইতে হয়। প্রতাপের বীরধর্ম্ম, চন্দ্রশেখরের বৈরাগ্য একটা অতি-উচ্চ আদর্শমাত্র—জীবনের ধূলিকঙ্কর-কণ্টকময় পথে মানুষের সাথী তাহারা নয়। ঐ অমরনাথকে

দেখ; সে ছোট নয়—বড়ও নয়, দোষেগুণে স্বভাবসুস্থ মানুষ; পুরুষের গুণ প্রায় সবই তাহার আছে, তবু তাহার জীবন এমন নিষ্ফল হয় কেন? আর ঐ নারী দুইটিকে দেখ; একজন ফুলের মত প্রেমের মধুসৌরভে পূর্ণ; আরেক জন সাধ্বী—প্রেমকে, হৃদয়ের সেই ক্ষুধাকে সে পদতলে চাপিয়া, জায়া নয়—গেহিনীরূপে পরের সংসার আগুলিয়া রহিয়াছে। দুইজনেই তো নারী—কাহারও প্রেম কম নয়। কিন্তু সেই প্রেম পুরুষের পক্ষে সুলভ নয়। নারীর ঐ প্রেমের মর্ম্ম পুরুষ বুঝিতে চেষ্টা করে; বুঝিলে তাহার আরাধনা করিবে, না বুঝিলে বিদ্রোহ করিবে—উৎসন্নে যাইবে। তৃতীয় পন্থা—সংসার ত্যাগ কর, আপনাতে আপনি শরণ লও, প্রেম-স্নেহের ক্ষুধা দৃঢ়ভাবে দমন কর। অমরনাথ সাধারণ পুরুষ,—সে তাহা পারে নাই—সে ঐ প্রেম দাবি করিয়াছিল। 'রজনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষের সেই ভাগ্যও যেমন, তেমনই নারীর সেই স্বতন্ত্র মহিমা ধ্যান করিয়াছেন।

আমি বলিয়াছি, ঐ চারিখানি উপন্যাসের চতুর্ব্বিধ প্রেরণার মূলে একই তত্ত্বের সন্ধান আছে। ঐ প্রেমই জীবনের একমাত্র প্রভু, সুহৃদ ও ত্রাণকর্ত্তা হইলেও তাহার সাধনায় নারী-পুরুষের শক্তির তারতম্য যেমন—আদর্শেরও পার্থক্য আছে। এই শেষের তত্ত্বটি বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উহাই 'রজনী'তে অমরনাথের জীবনে স্পষ্ট উঁকি দিয়াছে। এই উপন্যাসেই বঙ্কিম-কাব্যের একটি সকরুণ আর্ত্তস্বর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। অমরনাথ জীবনে সেই দাম্পত্যসুখের অধিকারী হইতে পারিল না—সে যেন ভাগ্যের অতিদৃঢ় প্রতিকূলতায়; তাই পুরুষ অমরনাথ সংসারের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অপার শূন্যতা ও নিঃসঙ্গতা বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এইখানেই বঙ্কিম-মানসের একটি বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়—তাহা এই যে, ঐ দাম্পত্য যতই অমৃতময় হউক, পুরুষ তাহার আশায় বসিয়া থাকিবে না। নগেন্দ্র দত্তের মত, নারীর আত্মোৎসর্গের দ্বারা নিজশক্তির অভাব পূরণ করিয়া লওয়াও যেমন হীনতা, তেমনই প্রতাপের মত দাম্পত্যহীন হইয়াই অবৈধ প্রেমকে ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারা মহিমান্বিত করার গৌরব যত বড়ই হউক—সে সার্থকতা জীবনের মধ্যে নয়, জীবনের বাহিরে। বঙ্কিমচন্দ্র

একদিকে প্রতাপচরিত্রের সেই নৈতিক বা আধ্যাত্মিক পৌরুষকে, এবং অপরদিকে দাম্পত্যবঞ্চিত চন্দ্রশেখরের মহানুভব পরদুঃখকাতরতার আদর্শকে প্রাণ ভরিয়া বন্দনা করিলেন বটে, এবং যেন একটা বড় সমস্যার সমাধান করিয়া অতঃপর কাণা ফুলওয়ালীর প্রেম-প্রতিমা গড়িতে বসিলেন। তথাপি সেই কবিলীলার অন্তরালেও সেই এক প্রশ্ন,—পুরুষের সুগম্ভীর নিয়তি ও নারীর রহস্যময়ী শক্তি আর এক মূর্ত্তিতে তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। দেখা গেল, এই উপন্যাসে "রজনী"র কথাটাই বড় নয়, তাহা একরূপ কাব্যবিলাস মাত্র; "মৃণালিনী"তেও আমরা ঠিক এইরূপ দেখিয়াছি; সেখানেও যেমন "পশুপতি" ও "মনোরমা", এখানেও তেমনই "অমরনাথ" ও "লবঙ্গ-লতা"। এমন তাঁহার অন্য উপন্যাসেও ঘটিয়াছে, যেমন 'রাজসিংহে'—"মবারক" ও "জেবউন্নিসা"। নারী-পুরুষের যে দাম্পত্যপ্রেম বঙ্কিমকে আকৃষ্ট ও আশ্বস্ত করিয়াছিল, তাহার ট্র্যাজেডি তিনি দুইবার দুইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন—'বিষবৃক্ষে' যাহার আরম্ভ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মাঝের দুইখানি উপন্যাসে তিনি ঐ দাম্পত্যকে গৌরব দান করিতে গিয়া যে তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহা আদৌ আশ্বাসজনক নহে; তাহার প্রতি তাঁহার ব্যক্তিহৃদয়ের যতবড় মোহই থাকুক,—কবিহৃদয় ও কবিদৃষ্টি সেই দাম্পত্যপ্রেমকে আর এক চক্ষে দেখিয়াছে; 'রজনী'তে সেই প্রেম একরূপ ব্যর্থই হইয়াছে—লবঙ্গলতার পতিপ্রেম দাম্পত্যপ্রেম নয়—ধর্ম্মচর্য্যা মাত্র। ইহার পর, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্যের যে ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে পুরুষ সেই দাম্পত্যপ্রেমের প্রতিক্রিয়ায় হলাহল পান করিয়া, শেষে সংসারকে ও জীবনকে ধিক্কার দিয়া, মহাপ্রস্থানের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল—'ভ্রমরাধিক ভ্রমর পাইয়াছি' বলিয়া সে ঐ দাম্পত্যপ্রেমকেও ধিক্কার দিয়াছে। গোবিন্দলালের বুকে যে ঝড় বহিয়াছে, অমরনাথে যেন তাহারই একটা শেষ কাতরশ্বাস আছে। অমরনাথের প্রকৃতি আরও ধীর ও শান্ত—তাহার পিপাসার উপরে ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতা—স্থির বিচারবুদ্ধি জয়ী হইয়াছে। অমরনাথ নগেন্দ্র দত্তের মত সূক্ষ্মভাববিলাসী নয়—গোবিন্দলালের মত ভোগপিপাসুও নয়; বরং যাহাকে অতি-সুশিক্ষিত cultured বা মার্জিতচিত্ত বলে, সে তাহাই।

অতএব, এই উপন্যাসের নায়কজীবনে—তাহার সেই অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বের যে নাটকীয় রূপ উপন্যাসের শেষভাগে ঘনাইয়া উঠিয়াছে—তাহাতে উহার ঐ লিরিক আখ্যানকল্পনাও একটি সুগম্ভীর জীবন-সত্যের মহিমা লাভ করিয়াছে। অপরপক্ষে, গোবিন্দলালের সেই প্রমাথী রিপুর তাড়নায় উপন্যাসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার কোথাও গভীরতা নাই, দ্বন্দ্ব নাই; একপ্রান্তে বারুণীর জলতলে রোহিণীর মৃত্যুশয্যা এবং অপরপ্রান্তে ভ্রমরের পুষ্পাবৃত মৃত্যুবাসর, এই দুইয়ের মধ্যে কোথাও আত্মার আর্ত্তনাদ নাই—গোবিন্দলালের রোহিণী-হত্যার মত মেলোড্রামা আর কি হইতে পারে? তাই বুঝিতে পারা যায়, ঐ 'রজনী'তে'ই কবি-বঙ্কিমের চিত্তে একটা গূঢ়-গভীর ভাবান্তর সুরু হইয়াছে—গোবিন্দলালের পরিণাম নয়, অমরনাথের ব্যর্থ জীবনেই তিনি তাঁহার সেই য়ুরোপীয় বা শেক্সপীরীয় জীবনদর্শন, তথা কাব্যপ্রেরণার একটা নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার পর তাঁহার কবিশক্তি অটুট থাকিলেও তাহার প্রেরণা ভিন্নমুখী; জীবনের উর্দ্ধে আর একটা কিছুর সন্ধানও যেমন, তেমনই জীবনেও একরূপ বৈরাগ্যসাধনা—নিষ্কাম কর্ম্মে ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে একটা রফার সম্ভাবনা—তাঁহার সেই জীবন-জিজ্ঞাসাকে নিরস্ত করিয়াছে, কবি-বঙ্কিম গীতার বাণী আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলির ধারা কিছু স্বতন্ত্র। কিন্তু রহস্যের কথা এই যে, এই narcotic তাঁহার সজ্ঞান-চেতনায় সেই কবিপ্রাণের উৎকণ্ঠাকে যতই প্রশমিত বা আচ্ছন্ন করুক না কেন, তাহাকে উন্মূলিত করিতে পারে নাই; ভূতভয়গ্রস্ত ব্যক্তির রাম-নাম করার মত, তিনি অতঃপর জীবনের যে ব্যাখ্যা ও পুরুষের পাপতাপের যে স্বস্ত্যয়ন-মন্ত্রই উচ্চারণ করুন না কেন,—কবির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াও, তলে তলে এই জীবনের বিষামৃতকে হেয় মনে করিতে পারেন নাই—তাঁহার সেই তান্ত্রিক নারী-পূজার মন্ত্রকে বৈদান্তিক মন্ত্রে শোধন করিয়া লইতে শেষ পর্য্যন্ত অকৃতকার্য্য হইয়াছেন; পরে সবিস্তারে সে আলোচনা করিব।

বঙ্কিমের কবিজীবনের যৌবনকাল এই চারিখানি উপন্যাসেই অবসিত হইয়াছে, ইহা সত্য; তথাপি, ইহার পরেও যে উপন্যাস আছে তাহাতেও গল্পরচনার পটুত্ব আছে, কবিত্ব আছে—কেবল জীবনকে

দেখিবার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—অথবা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা আছে। মনে হয়, নর-নারীর ব্যক্তিজীবনের সেই অসীম রহস্য তাঁহাকে আর উৎকণ্ঠিত করে না, সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া তিনি যেন অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতেছেন—'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে আমরা ইহারই আভাস পাই; ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সংসার ও সমাজ—জাতি ও দেশের কল্যাণ তাঁহার কবিকল্পনার ইষ্ট হইয়াছে; এবং নিজের জীবনেও, গোবিন্দলালের মত 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর'-এর চিন্তায় আশ্বস্ত হইতে চাহিয়াছেন। তথাপি দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে; 'রজনী'তে তিনি অমরনাথের জবানীতে যাহা বলিয়াছিলেন—'সীতারামে' সেই দারুণ নৈরাশ্যের মধ্যেও, তিনি প্রায় তেমনই, সেই ক্ষুধার কাতরশ্বাস দমন করিবার ছলে বলিয়া উঠিয়াছেন—

"তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যে দিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেইদিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। ততদিন এসো, আমরা বুক বাঁধিয়া হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মেলে।"

—এই যে বৈরাগ্য, ইহা কেমন বৈরাগ্য? এ যেন সেই সব ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াই, যাইবার কালে বুক বাঁধিবার জন্য হরিনাম করা,—কোন রকমে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা। কিন্তু এ সকল কথা পরে, আমরা এইবার বঙ্কিম-কাব্যের সেই তৃতীয় ও শেষ স্তরে প্রবেশ করিব।

চতুর্থ বক্তৃতা

[বঙ্কিম-উপন্যাসের শেষ পর্ব্ব ; জীবন-জিজ্ঞাসায় নূতন তত্ত্বসন্ধান ; পরবর্ত্তী তিনখানি উপন্যাস—'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'সীতারাম' ; শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ'। বঙ্কিম-উপন্যাসের রচনা-রূপ ও তাহাদের অন্তর্গত ট্র্যাজেডি।]

(১)

আমি বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবন বা কবিমানসের ইতিহাসে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল,—এ পরিবর্ত্তন বহির্জীবন-নিরপেক্ষ। কিন্তু অনেক সময়ে সেই ভিতরকার জীবনকে বাহিরের জীবন যেন সাহায্য করে, ধাক্কা দিয়া তাহার পথ আরও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বহির্জীবনের ইতিহাসও যেমন প্রায় অজ্ঞাত রহিয়াছে, তেমনই তাহার সমান্তরালে তাঁহার অন্তরে কি ঘটিতেছিল, সে সংবাদ ঘুণাক্ষরেও তিনি প্রকাশ করেন নাই—এতবড় আপনাতে-আপনি সমাহিত, নিজহৃদয়রুদ্ধকারী পুরুষ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল ; তিনি কোথাও কোন ছলে আত্মজীবনকথা প্রকাশ করেন নাই। তথাপি তাঁহার উপন্যাস-রচনার কালক্রম হইতেই ভিতর ও বাহিরের একটা মিল লক্ষ্য করা যাইবে। ১৮৭৮ সালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনার পর বঙ্কিমচন্দ্র যেন কিছুকাল লেখনী ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এই সময়ে নাকি একটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। আমরা তাঁহার অন্তর্জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিবার যে সুস্পষ্ট কারণ অবগত হইয়াছি, তাহাতে বহির্জীবনের ঐ ঘটনা সেই মানসিক পরিবর্ত্তনের একটা অতিরিক্ত কারণ মাত্র। আমরা দেখিতে পাই, ১৮৭৮ সালের পর প্রায় চারিবৎসর তিনি কাব্যরচনা একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়। বোধ হয় নূতন করিয়া চিত্তস্থির করিতে, এবং একটা নবতর কাব্য-প্রেরণা লাভ করিতে এই সময়টুকু লাগিয়াছিল। ইহার পরেও তিনি

উপন্যাস-রচনায় চিত্তসংযোগ করিতে পারেন নাই। 'আনন্দমঠে'র প্রায় দুই বৎসর পরে, তিনি 'দেবী চৌধুরাণী' রচনা করেন, এবং তাহারও তিন বৎসর পরে—'সীতারাম'। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্কিমের কবিজীবন আর সমানবেগে বা একই খাতে প্রবাহিত হইতেছিল না। তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা যেন আর নাই; কবিদৃষ্টির সেই একাগ্রতাও যেমন নাই, তেমনই কবিকর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠাও নাই। তথাপি সেই অগ্নি—প্রতিভার সেই সর্ব্বনিরপেক্ষ স্বভাবদীপ্তি নিরুদ্ধ থাকিলেও নির্ব্বাপিত হয় নাই। কেবল জীবনকে হৃদয়শোণিতরাগে রঞ্জিত করিয়া দেখিবার সেই আকুতি আর নাই, খেয়া পার হইয়া ওপার হইতে এপারকে তিনি যেন কতকটা আত্মনির্লিপ্তভাবে দেখিতেছেন; সমাজ-জীবন, জাতি-জীবন ও মনুষ্য-জীবনের যে শাশ্বত ধর্ম্মভিত্তি—সৃষ্টির সেই ধর্ম্মধাতু তাঁহার সমগ্র হৃদয়মনকে একটা আক্ষেপহীন, শান্ত ও নির্ব্বিকার অভয়-আনন্দের আশ্বাসে প্রলুব্ধ করিতেছে। চিত্তের এই অবস্থায় সেই সহজাত কবিপ্রতিভার কাজ কি হইবে? মানুষ-বঙ্কিম ও কবি-বঙ্কিম —এই দুইয়ের মধ্যে রফা হইবে কেমন করিয়া? পারমার্থিক আদর্শ জীবনের সত্য হইতে পারে না—সেই ধর্ম্ম ও জীবনধর্ম্মে একটা মূলগত বিরোধ আছে। কবি-বঙ্কিমের চেয়ে তাহা এত গভীর করিয়া আর কে উপলব্ধি করিয়াছিল?' এই অশেষ সংশয়ক্ষুব্ধ জীবনের ঝটিকান্ধকারে তাঁহার কবিকল্পনা অমিত পক্ষবলসহকারে ঊর্দ্ধ আকাশ ভেদ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণমুক্ত হইয়া—সেই স্তব্ধসুন্দর অনির্ব্বাণ তারকারাজ্যে পৌঁছিতে পারে নাই; শুধু পক্ষই ক্লান্ত হয় নাই, প্রাণও কাতর হইয়াছিল। জীবনের সেই ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বজ্রালোকের মধ্যেই প্রাণবান্ পুরুষের যে উল্লাস—তাহার সেই হাসি-ক্রন্দনের মূল্যও কম নহে;—যে এই অসীম বেদনার বিপুল বারিধিবক্ষে সন্তরণ করে বলিয়াই, ঊর্দ্ধ আকাশের প্রশান্ত নীলিমা এমন মনোহর বোধ হয়। জীবনের এই খরস্রোতা, কল্লোলাকুল, কলনাদিনী নদীকূলে বসিয়াই সেই শান্তি সম্ভোগ করা যায় না। কবি-বঙ্কিম জীবনের সহিত সেইরূপ একটা রফা করিবেন,—হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় তাহার একটা নির্দ্দেশ আছে; ঐ বাসনা-কামনাকেই ভিন্নমুখী করিতে হইবে—ব্যক্তির আত্মসুখ-পিপাসাকে পাত্রান্তরিত করিতে হইবে। হৃদয়ের সেই উত্তাপ

—সেই প্রবৃত্তিবেগকেই আর এক পথে চরিতার্থ করা যায়, 'আত্ম' হইতে 'পরে' তাহাকে স্থাপনা করিতে পারিলে, পরাজয়ের গ্লানি আর থাকিবে না; সেই ব্যথাও—পরার্থে আত্মবিসর্জনের সেই যন্ত্রণাও—মধুর মনে হইবে। এই মানবপ্রীতি বা মানবসেবা-মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের তরুণ-বয়সেই তাঁহার মনে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সমগ্র চিৎ-সত্তা তৃপ্ত হইতে পারে নাই; সেই অতৃপ্ত পিপাসাই প্রবল কাব্যস্রোতে উৎসারিত হইয়াছিল। এখন আবার সেই মন্ত্রকেই আর একরূপে আত্মার গভীরতম ক্ষুধার সহিত মিলাইয়া তিনি তাঁহার শেষ কবি-কৃত্য করিতে মনস্থ করিলেন; তাঁহার ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের এই শেষভাগে তত্ত্বের সঙ্গে কাব্যের—চিন্তার সঙ্গে অনুভূতির দ্বন্দ্ব কিছু অধিক হইয়াছিল,—হইবারই কথা; তার প্রমাণ, তিনি এইকালে তাঁহার কবিপ্রেরণাকে দমন করিয়া সেই তত্ত্বকেই একটা নূতন যুক্তি-বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে ঘোরতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন,—'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার পর তিনি 'অনুশীলন' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরতম অন্তরের ইতিহাস কি? পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে তাহাই আছে।

(২)

'আনন্দমঠ'—'দেবী চৌধুরাণী'—'সীতারাম'; গল্পরচনার সেই বিস্ময়কর শক্তি এখনও তেমনই আছে; ঐ শক্তিই বঙ্কিমের কবিশক্তিরও একটা বড় লক্ষণ; উহাতেই তাঁহার কল্পনার মুক্তিও যেমন, তেমনই সর্ব্বচিন্তা, সর্ব্বসংস্কারমুক্ত কবিত্বের একটি অপূর্ব্ব উল্লাস তাহাতে ফুটিয়া উঠে। আমি এই তিনখানি উপন্যাসের বিস্তারিত পরিচয় করিব না, যতদূর সম্ভব, সংক্ষেপে ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমের কবিমানস ও কাব্য-সৃষ্টির গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিব।

'আনন্দমঠে'র কাব্যবস্তু হইয়াছে দেশপ্রেম; সেই দেশপ্রেমের এমন কবিত্বময় বিগ্রহসৃষ্টি বোধ হয় জগৎসাহিত্যে বিরল; অতএব কাব্যের দিক দিয়াও এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির

অন্যতম ; ইহাকে কেবল একটা বিশেষ Cult বা ধর্ম্মমন্ত্রের প্রচার-মূলক উপন্যাস বলিয়া পৃথক করিলে চলিবে না। এই উপন্যাসে কবিকল্পনা ও ভাবানুভূতির যে প্রগাঢ়তা আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রৌঢ় কবিশক্তির নিদর্শন। কবির প্রাণ ও মন যেন একটা মহা-সঙ্গীতের আবেগে আপনাকে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে—আবেশ বা Inspiration-এর এমন সঙ্গীতময় ঐক্যতান—প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঘটনার রোমান্স, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-চিত্রণে বাস্তব ও কল্পনার এমন সুসঙ্গতি, এবং সকলের ভিতর দিয়া সেই এক মহাভাবের অনুরণন—একাধারে উপন্যাস ও গীতিকাব্য, নাটক ও কাহিনীর এমন রাসায়নিক রসমিশ্রণ আর কোন কাব্যে হয় নাই—জীবনের বাস্তবকে আরও গভীর করিয়া দেখা ও তাহার সেই রহস্যকে সীমাহীন করিয়া তোলার কথা স্বতন্ত্র। আমি এই উপন্যাস সম্বন্ধে পূর্ব্বে অন্যত্র যাহা বলিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত করিব—উপন্যাস হিসাবে 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে উহার অধিক বলিবার অবকাশ এখানে নাই।—

"সকল বড় কাব্যের লক্ষণই এই যে, তাহাতে জীবনের একটা জটিল ও গভীর অভিজ্ঞতা কোন একটা বিশিষ্ট ভাবকল্পনার ঐক্যসূত্রে সুসম্বদ্ধ আকার ধারণ করে। 'আনন্দমঠে' দেশপ্রেমের কল্পনাসূত্রে কবি-বঙ্কিম তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত গভীর ও জটিল অভিজ্ঞতাকে একটি রসরূপ দান করিয়াছেন। দেশপ্রেমকেই পুরুষের একটা মহৎ ধর্ম্মরূপে স্থাপনা করিয়া, তিনি সেই এক সমস্যাকে—বাস্তব ও আদর্শের বিরোধকে—দেহ-আত্মার দ্বন্দ্বকে—আরও সবল ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে চাহিয়াছেন ; যেন দেশপ্রেমের তাড়িতশক্তি উৎপাদন করিয়া তাহার রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের দেহ-মন-প্রাণকে তরঙ্গিত ও মথিত করিয়া, তিনি মনুষ্যত্বের মূল উপাদানগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। দেশপ্রেম-রূপ একটা ভাবাবেগমূলক ধর্ম্মের সংঘাতে মানুষের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক যতকিছু সংস্কারকে বিধ্বস্ত, উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিনি তাহার শক্তি ও অশক্তির সীমা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির ঘনীভূত একাগ্র কল্পনায়—যৌনপ্রবৃত্তি বা রূপমোহ, দাম্পত্যপ্রেম, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার, সংসারত্যাগ বা

সন্ন্যাসের আদর্শ, যুগধর্ম্ম ও সনাতন শাশ্বত-পন্থা—এ সকলই একটি ভাব-সত্যের আশ্রয়ে সুসমাহিত হইতে পারিয়াছে। এই গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি নৈশ-গম্ভীর অরণ্যচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাতে যে একটি atmosphere বা মনোভূমির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেজন্য চরিত্র ও ঘটনাগুলির মধ্যে যে ভাবগত সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির নিদর্শন। এইজন্য 'আনন্দমঠ' কেবল দেশপ্রেমের উদ্দেশ্যমূলক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য নয়, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত লেখনীর একখানি উৎকৃষ্ট রস-রচনা।" [বঙ্কিম-বরণ, পৃঃ ১১০]

অতএব, এক হিসাবে উহাকেই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহাতেই কবিমানসের স্পষ্ট ধর্ম্মান্তরগ্রহণও লক্ষ্য করা যাইবে। ঐ দেশপ্রেমই তাহার খাঁটি কবিপ্রেরণার শেষ উজ্জীবনকারণ হইয়াছিল,—ইহার পর এতবড় ভাবাবেশ তাঁহার কবিচিত্তকে আবিষ্ট করে নাই। কিন্তু ঐ 'আনন্দমঠে'র কাব্যারম্ভে যে 'উপক্রমণিকা'টি যুক্ত হইয়াছে, তাহার মত উদাত্ত-গম্ভীর কল্পনাঘন কাব্যখণ্ড বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও নাই,—এখানে তাহার একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"অতি বিস্তৃত অরণ্য—গাছের মাথায় মাথায়, পাতায় পাতায়, মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য। ......নীচে ঘনান্ধকার—মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখনো মনুষ্য যায় না। ...একে এই বিস্তৃত অতিনিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল—

'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এই অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শোনা গিয়াছিল। কিছুকাল পরে

আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল—

'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল—'তোমার পণ কি?' প্রত্যুত্তরে বলিল—'পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।' প্রতিশব্দ হইল—'জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

—'আর কি আছে? আর কি দিব?'

তখন উত্তর হইল—'ভক্তি'।"

—এখানে ঐ যে ঋষিমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, তাহাও এমন এক আধ্যাত্মিক সাধনার দীক্ষামন্ত্র যে, নরনারী-জীবনের সেই আদি-অন্তহীন সমস্যাকে —সেই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির রহস্যান্ধকারকে একরূপ অস্বীকার করাই হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ওখানে ঐ যে 'ভক্তি'র কথা বলিয়াছেন—তাহাতে এই মনুষ্যজীবনের চেয়ে মূল্যবান্ একটা কিছুর জয়ঘোষণা আছে। 'আনন্দমঠে'র কবিও এই ঋষিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, ঐ কাব্যের প্রেরণামূলে এই মহাবৈরাগ্যমন্ত্র রহিয়াছে; কেবল সেই মন্ত্রকে এমন কাব্যসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিবার উপায় তিনি পরে আর খুঁজিয়া পান নাই।

ইহার পরেই 'দেবী চৌধুরাণী'। এই উপন্যাসখানিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমানসের স্বেচ্ছা-পরাজয় বলা যাইতে পারে। গল্প-রচনার সেই যাদুশক্তি ইহাতেও আছে—বঙ্কিমী কাব্যরসও ইহার কোন কোন অংশে উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সেই কবিশক্তিকে একরূপ জোর করিয়া তিনি এই উপন্যাসে শাস্ত্রোপদেশের ভার বহিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার অন্তর্গত অভিপ্রায় এই যে—দেশ ও সমাজ এই দুয়ের কল্যাণ-সাধনই নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা বটে, তাহাতেই মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা; কিন্তু কর্ম্মের ছোট-বড় নাই—তাহাতে ঘনঘটা বা বীরত্বাভিমান নিষ্প্রয়োজন; বিশেষ, বাঙালীর পক্ষে তাহার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম গার্হস্থ্য জীবনেই পালনীয়—সেই গৃহধর্ম্মপালনেই, গীতোক্ত কর্ম্মযোগ-সাধনার অবকাশ আছে। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ কবি নয়—ধর্ম্মোপদেষ্টার ভূমিকায় ঐ উপন্যাস রচনা

করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, কাব্যই উহার উৎকৃষ্ট বাহন—মহাভারতকার তো তাহাই করিয়াছেন। ফলে যাহা হইয়াছে তাহার মত দুর্ঘটনা সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে আর কোথাও ঘটে নাই। এখানেও সেই নারী-ই হইয়াছে পুরুষের দাসী ও গুরু দুই-ই। নারীর সেই বামা মূর্ত্তি আর নাই—দক্ষিণা মূর্ত্তি; পুরুষ-জীবনের সকল সমস্যা ঐ নারীই পূরণ করিয়াছে—গৃহ-সংসারের যে সাধনভূমি তাহা তো নারীরই অধিকারভুক্ত; আবার, নারীই একাধারে প্রেমময়ী ও বৈরাগিণী; পুরুষ তাহা নহে, সে হয় সব ত্যাগ করে, নয় সব লুটিয়া ভোগ করিতে চায়। অতএব, এই উপন্যাসে বঙ্কিম একটা বড় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন,—মহাশক্তির অংশ যে নারী, তাহাকেই গৃহসংসারে—ক্ষুদ্র জগতের জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা তো বটেই—অধিকন্তু, তাহাকে অনুশীলনের দ্বারা গীতাধর্ম্মের শরীরী বিগ্রহরূপে গড়িয়া লইয়াছেন। তাহাতেই একটা বড় সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। মানুষের জীবন, সৃষ্টির রহস্যধ্যান, নিয়তির কঠিন শৃঙ্খল, পুরুষ ও প্রকৃতির সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব—এই বিপুল বিশাল কালপ্রবাহে নর-নারীর নিরুপায় দিশাহীন সন্তরণ, এ সকলই 'দেবী চৌধুরাণী'তে আসিয়া লয়প্রাপ্ত হইল। জীবন ও জীবনের কাব্য ঐ একটি তত্ত্বের সীমায় তাহাদের অসীমতা পরিহার করিল। এই 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র সেই একবারমাত্র তত্ত্বের খাতিরে তাঁহার কবিশক্তির অবমাননা করিয়াছেন।

তথাপি, ইহাতেও দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছেঃ প্রথম, এই উপন্যাসেও একটি চমৎকার গল্প সৃষ্টি হইয়াছে; ঐ ধর্ম্মতত্ত্বের খোলসটি খুলিয়া লইলে, গল্পটির কোন দোষ আর থাকিবে না; গল্পটি ভিতরে ভিতরে এমন পৃথক্ হইয়া আছে, যে একটুতে তাহা খুলিয়া আসিবে। ইহাতে প্রমাণ হয়, এত ধর্ম্মতত্ত্ব সত্ত্বেও, কবি-বঙ্কিম নিজধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। উহার স্থানে স্থানে কবিকল্পনার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, নিজ কবিধর্ম্মকে পীড়িত করিয়া এই যে তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার উৎসাহ, ইহাতে একটা একরোখা জবরদস্তির ভাব আছে—যেন জোর করিয়া একটা কিছুকে আশ্রয় করিতে হইবে, নহিলে মঙ্গল নাই—এবং মঙ্গল চাই-ই। এমনিভাবে আরও তিন বৎসর কাটিল, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সাহিত্যিক জীবনে—তাঁহার সেই ব্যক্তিগত

সাধনায়—গীতাধর্ম্মের আচরণ করিতেছিলেন, অর্থাৎ, তিনি নিজ প্রাণের সেই আদি উৎকণ্ঠা দমন করিয়া, লোকহিতার্থে তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত সহিল না; সেই চিত্ত-নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ১৮৮৭ সালে 'সীতারাম'-উপন্যাসে তিনি তাঁহার কবিজীবনের রুদ্ধ হাহাকার একেবারে মুক্ত করিয়া দিলেন। "সীতারামে"র ট্র্যাজেডি তাঁহার নিজেরই কবিজীবনের ট্র্যাজেডি;—সকল তত্ত্ব, সকল ধর্ম্মোপদেশ, এবং সর্ব্ববিধ আশা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এমন উন্মাদ আর্ত্তরব আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। সেই নারী-পুরুষ, এবং সেই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি—এই শেষবার কবি-বঙ্কিমকে যে-আকারে অভিভূত করিয়াছে, তাহার কোন স্বস্ত্যয়ন-মন্ত্র নাই।

বস্তুতঃ 'সীতারাম'-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-জিজ্ঞাসার সকল সমাধান ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছে। পুরুষ-জীবনের দুরদৃষ্ট এবং পুরুষ-চরিত্রের যতকিছু সম্মোহ, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও আত্মদ্রোহের উন্মত্ততা —সকলই ইহাতে একটা প্রলয়কান্তি ধারণ করিয়াছে। অথচ, "সীতারাম" পৌরুষ-বীর্য্যের অবতার—হৃদয়ের পুরুষোচিত বিশালতা, ক্ষত্রিয়োচিত ঈশ্বরভাব, অতি উচ্চ ধর্ম্মজ্ঞান এবং লোককল্যাণ-কামনা—পুরুষের যতকিছু পুরুষধর্ম্ম, সকলের সমাহার হইয়াছে এই "সীতারামে"। সেই "সীতারাম" এ কোন্ নিয়তির নির্ব্বন্ধে এবং অন্তরের কোন্ অতলস্পর্শী কামনার পিপাসা-বিকারে আপনাকে এবং একটা সুমহতী কীর্ত্তিকে—ধর্ম্মবলে ও বাহুবলে স্থাপিত রাজ্যকে—নির্ম্মমভাবে বিনাশ করিল। এখানেও সেই নারী; কিন্তু রূপতৃষ্ণাই নয়—নারীর দেহমনের অতুল মহিম-শ্রী, এবং আত্মানুরূপ জীবনসঙ্গিনীর সহিত বৈধ মিলনাকাঙ্ক্ষা! সেই নারী পতিপরায়ণা ও পতির পরম হিতৈষিণী হইয়াও স্বামীর ভাগ্যে বিষকন্যা হইয়া দাঁড়াইল। এমন অদ্ভুত নিয়তি —এবং নারীকেই সেই নিয়তির সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরূপে স্থাপনা করা, এমন একটা কল্পনার আভাস দেয়, যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমানসের গভীর-গহনে যেন আদি হইতেই বিদ্যমান ছিল। সেই কপালকুণ্ডলা ও মনোরমারই এ যেন আরেক সংস্করণ; তফাৎ এই যে, এখানে নিয়তির সহিত নারীহৃদয়-রহস্য নয়, একটা ধর্ম্মতত্ত্বের যোগ হইয়াছে; তাহাতেই সেই নারী স্বভাবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেবীত্বের সাধনায় ইহ-পরকাল

হারাইল। 'দেবী চৌধুরাণী'র মত 'সীতারামে'ও বঙ্কিমচন্দ্র বড় ঘটা করিয়া গীতার ধর্ম্মতত্ত্ব আমদানি করিয়াছেন, কিন্তু সে যেন সেই ধর্ম্ম-তত্ত্বকেই ব্যঙ্গ করিবার জন্য। "প্রফুল্লে" যাহার এমন সাধনা ও সিদ্ধির গৌরব-ঘোষণা হইয়াছে, "শ্রী"তে তাহার নিরতিশয় ব্যর্থতাই তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার ও প্রমাণ করিয়াছেন। সীতারাম তাহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীকে পাইয়াও পাইল না ; না পাইলেও হয়তো এমন সর্ব্বনাশ ঘটিত না ; কিন্তু প্রাপ্ত বস্তুর ঐ দুষ্প্রাপ্যতাই তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। ম্যাকবেথের সেই ডাইনীদের কথা যেমন সত্য-মিথ্যার ভেল্কিতে মতিভ্রম ঘটাইয়াছিল, এখানেও তেমনই ঐ জ্যোতিষ-গণনার একটা হেঁয়ালী-বাক্য যে নিয়তিকে এমন করাল করিয়া তুলিয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে নারীর নারীত্ব ও পুরুষের পৌরুষ তৃণের মত ভাসিয়া গেল। এ সকলই বঙ্কিমের কবিদৃষ্টির শেষ সাক্ষ্য ; তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই সৃষ্টির ও মানবভাগ্যের গভীরতর প্রদেশে ঐ এক অন্ধকারই আছে, এবং "কপালকুণ্ডলাই" হৌক, আর "মনোরমাই" হৌক, আর "শ্রী"ই হৌক—পুরুষের পক্ষে, সেই ভাগ্যের সহিত শক্তিপরীক্ষার যুদ্ধে, নারীর সকল মূর্ত্তিই সমান ; বৈরাগিণী, হিতৈষিণী বা সত্যকার অর্দ্ধাঙ্গিনী যেমনই হোক—জীবনের স্রোতোবেগ একটু গভীর হইলে পুরুষ নিরাশ্রয় হইবেই। উপন্যাসের দিক দিয়া 'সীতারাম' তেমন সুকল্পিত বা সুগ্রথিত না হইলেও, ইহার ঐ ট্র্যাজেডি-কল্পনায়—বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার সেই জীবন-জিজ্ঞাসায় যে একটা দৃঢ়তর ভূমি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডিকেই মূলতঃ বরণ করিয়াছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হইতে হয় এইজন্য যে, 'আনন্দমঠে' তিনি যে বৃহত্তর লোক-কল্যাণের জন্য, বা বড় একটা কিছুর জন্য আত্মোৎসর্গকেই পুরুষের পরমার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন,—এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে যে ধর্ম্মতত্ত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাধনযোগ্য বলিয়া সকল উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন, 'সীতারামে' সেই সকলের নিষ্ফলতা প্রদর্শন করিয়া, সেই জীবন-জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। "প্রতাপ", "চন্দ্রশেখর", "গোবিন্দলাল", "অমরনাথ", "ভবানন্দ"—এ সকলের পরে ঐ "সীতারাম" ; সে যেন একটা বিরাট্ অট্টহাস্য—হায় পুরুষ, হায়

তাহার ভাগ্য। Vanity of vanities, all is vanity! কাব্যকল্পনাই বল, আর দার্শনিক মহাতত্ত্বই বল—পুরুষের পৌরুষই বল, আর নারীর প্রেমই বল, এই পৃথিবীর প্রস্তর-কঠিন ভূমিতলে একটু বলে আছড়াইতে গেলেই ঐ কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই মিলিবে না।

তাই বলিয়াছি, 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-জিজ্ঞাসায় সকল তত্ত্বের উপরে জীবনের রহস্যই জয়ী হইয়াছে; যে-জীবনকে শেক্সপীয়ার আরও মুক্তদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, যে-জীবনকে যোগী-সন্ন্যাসী মৃত্যুরই মায়াময় মনোহর রূপ বলিয়া ঘৃণায় বর্জন করে, এবং গৃহী-মানুষ, যত ভয় পায় ততই অন্ধ-মমতায় জড়াইয়া ধরে,—বঙ্কিমচন্দ্র সেই জীবনের একটা অর্থ করিতে চাহিয়াছিলেন,—উহাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে নয়, তান্ত্রিকের মত উহার নিকট হইতে ভোগ ও অপবর্গ দুইই আদায় করিয়া লইতে। তিনি মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য প্রেমের আরাধনা করিয়াছিলেন, ও সেই প্রেমের শক্তিরূপে পুরুষের উপরে নারীকে স্থান দিয়া, সেই নারীর বামা ও দক্ষিণা দুই মূর্ত্তির ধ্যানে পুরুষের জয়-পরাজয়ের কারণ সন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই শক্তির দশমহাবিদ্যারূপ তাঁহাকে ত্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে; তিনি জীবনকে, তথা সেই শক্তির অপার অপ্রমেয় রহস্যকে কোন অর্থের বন্ধনে বাঁধিতে পারেন নাই—অন্ততঃ তাঁহার কবিদৃষ্টি লইয়া। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা যে-বঙ্কিমকে দেখিতে পাই, সে-বঙ্কিম ধর্ম্মতত্ত্বপ্রণেতা, নীতি-সত্যপরায়ণ বঙ্কিম নহেন ; প্রকৃতির দুর্ব্বার ও অন্ধশক্তির লীলা—যাহাকে আমরা নিয়তি বলি—তাহারই পানে স্থির-নিবদ্ধদৃষ্টি এবং ভয়ে-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত, হৃষ্ট ও ব্যথিত, অতিগভীর সংবেদনশীল, ঊর্দ্ধগ কল্পনার অধিকারী এক অনন্যসাধারণ কবি। সত্য বটে, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে প্রায় সর্ব্বত্র একটা তত্ত্বের সন্ধান আছে, কিন্তু সেই তত্ত্বের সহিত জীবনের বাস্তব-সত্যের বিরোধই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, সন্ধির শতচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামই নিরবচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। মানবপ্রেম, ভগবৎপ্রীতি, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়-জয়—এ সকলের মূল্য যেমনই হউক, তত্ত্বচিন্তা যতই সুখকর হউক—সেই নিয়তিকে বাঁধিবে কে? বরং যাহার প্রাণ যত বড়, যাহার আকাঙ্ক্ষা যত বৃহৎ, যাহার অনুভবশক্তি যত তীক্ষ্ণ, তাহাকেই ঐ

তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে হইবে। এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই কবিদৃষ্টিতে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিগুলির মর্ম্মার্থ—এক মনীষী সমালোচক যে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিরও অন্তস্তলবাহিনী মর্ম্মকথা তাহাই, যথা—

"Doctrine, theory, metaphysics, morals—how should these help a man at the last encounter? All doctrines and theories, concerning the place of man in the universe and the origin of evil are a poor and partial business compared with that dazzling vision of the pitiful estate of humanity which is revealed by tragedy .... Here we have to do with an earthquake, and good conduct is of no avail. Morality is denied : it is overwhelmed and tossed aside by the inrush of the sea." ....

"They deal with greater things than man—with powers and passions, elemental forces and dark abysses of suffering, with the central fire, which breaks through the crust of civilization and makes a splendour in the sky—above the blackness of ruined houses."

(Walter Raleigh : *Shakespeare*)

অর্থাৎ—"সাম্প্রদায়িক মতবাদ, দার্শনিক সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মনীতি—মানুষের সেই অন্তিম সঙ্কটে এ সকল কোন্ কাজে লাগিবে? ট্র্যাজেডিজাতীয় নাটকে মানুষের চরম দুর্গতির যে ভীষণোজ্জ্বল দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহার সম্মুখে ঐ সকল তত্ত্ব—যেমন, সৃষ্টির সহিত মানুষের সম্বন্ধ, অমঙ্গলের উৎপত্তি প্রভৃতির ব্যাখ্যা—নিতান্ত তুচ্ছ ও অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ......এখানে কোন অন্যায় বা অসঙ্গতির প্রশ্নই উঠে না, এ যেন একটা ভূমিকম্প। কোন ধর্ম্মাধর্ম্মই মানে না; সকল ধর্ম্ম, সকল নীতি বিপুল সমুদ্রবন্যায় ডুবিয়া যায়, সেই তরঙ্গতাড়নায় দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।" ....

"ঐ ট্র্যাজেডিগুলার বিষয়বস্তু কেবল মানুষের কাহিনীই নয়—তার চেয়ে অনেক বড়; যথা—অন্ধ প্রবৃত্তি; প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ড

লীলা; দুঃখের অতল অসীম অন্ধকার; এবং সৃষ্টির অন্তর্দ্দেশের সেই অগ্নিশিখা, যাহার আকস্মিক উৎপাতে, ধরণীপৃষ্ঠের মতই মনুষ্যসমাজের শোভনসুন্দর, সুদৃঢ় আচ্ছাদনখানি নিমেষে টুটিয়া ফাটিয়া যায়, এবং সেই অনলোৎগারে ভস্মীভূত অগণিত কুটীরের অঙ্গাররাশির উপরে উর্দ্ধাকাশ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে।"

—তফাৎ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় অধ্যাত্মসংস্কার শেক্সপীয়ারের মত উহাকে পরমনির্লিপ্ত নির্ব্বিকারচিত্তে বরণ করিতে চাহে নাই—বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিয়াছে; 'সীতারাম'-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই স্বীকারোক্তি সকল কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু ইহার পরেও বঙ্কিমচন্দ্র আর একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন—'রাজসিংহ'; এই উপন্যাসখানিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হইবে; 'দুর্গেশনন্দিনী' যেমন তাঁহার কবিজীবনের প্রথম রোমান্স, 'রাজসিংহ'ও তেমনই তাঁহার জীবন-শেষের শেষ রোমান্স—কবিহৃদয়ের "swan-song"। ইহাতে সর্ব্বজিজ্ঞাসা, সর্ব্ব-জীবন-সমস্যার সর্ব্বভাবনামুক্ত হইয়া, কবি-বঙ্কিম তাঁহার কল্পনার উপাধানে ক্লান্ত ললাট ন্যস্ত করিয়া আপন কবি-জীবনের একটি বিষামৃত-মধুর রমণীয় স্বপ্ন দেখিয়াছেন,—সেই মবারক-জেবউন্নিসার প্রেম-কাহিনী। যৌবনশেষে, প্রায় বার্দ্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়াইয়া এত জ্ঞান, এত চিন্তা, এত অভিজ্ঞতার পরে, তেমন স্বপ্ন দেখা কি শোভা পায়? তাই সেই বাহিরের সজ্জা, সেই বয়সোচিত গুরুত্ব রক্ষা করিয়া তিনি মোগল-ইতিহাসের এক অধ্যায় খুলিয়া ধরিলেন, তাহাতে তাঁহার আকৈশোর সেই ইতিহাস-প্রীতিও যেমন, তেমনই রাজধর্ম্ম ও লোক-ধর্ম্মের, তথা সার্ব্বভৌমিক নীতিধর্ম্মের একটা গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যান একইকালে চরিতার্থ হইবার অবকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ সকলই সেই বাহিরের সজ্জা; ঐ যুদ্ধ, ঐ রণশিবির ও সেনা-সমারোহ—সন্ধিবিগ্রহের যতকিছু কূটনীতি, এবং রূপনগরওয়ালী ও আরংজীব-রাজসিংহের ঐ আজব-কাহিনী—একটি লিরিক কবিতার এপিক ভূমিকার মত; বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রাণ আর এক কাহিনীর স্বপ্নরসে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই চিরন্তন মানব-মানবীর—সেই যুগল প্রেমের—অসহ্য জ্বালা ও অসহ্য সুখের কাহিনী; এ স্বপ্ন সেই

প্রেমের—যে-প্রেমে রাজনন্দিনী ভিখারিণী হয়, এবং অতি সামান্য সাধারণ জীবনযাত্রী পুরুষ প্রেমের রাজতিলক ললাটে পরিয়া মহামহীয়ান হইয়া উঠে। এ প্রেমে যেমন, নীতি-দুর্নীতির ভাবনামাত্র নাই—তেমনই, জীবন ও মৃত্যু একই অমৃতরাগে অরুণ হইয়া উঠে! বৃন্দাবনের রাখালও যেমন এই প্রেমের গীতিস্বর তাহার বাঁশের বাঁশীতে বাজায়, তেমনই অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও বিষপাত্রের ফেনোচ্ছ্বাসে ইহারই রক্তরাগ আর একরূপে ঝলসিয়া উঠে। এ প্রেম এমনই যে, তাহাকে হারাইয়া যত না দুঃখ, পাওয়ার দুঃখ তাহারও অধিক। প্রেমিকা যখন প্রেমাস্পদকে বলে, "আমি তোমাকে ভালবাসি", তখন প্রণয়ীর দুই চক্ষে শ্রাবণ-মেঘের ঘোর নামিয়া আসে, হৃদয় ব্যথায় বিদীর্ণ হয়—মৃত্যুর পাত্রে এ অমৃত সে রাখিবে কেমন করিয়া? 'রাজসিংহ'-উপন্যাসে সেই প্রেমের যে অপূর্ব্ব গীতি-মূর্চ্ছনা আছে, তাহার তুলনায় উহার বৃহত্তর কাহিনী ম্লান হইয়া গিয়াছে; এই সুবৃহৎ উপন্যাসের অন্তঃস্রুত কাব্যধারা শেষে সেই যে একটি পরিচ্ছেদে যেন উদ্বেলিত হইয়া নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রাণের শেষ স্বপ্ন—এবং কবি-জীবনের শেষ প্রয়াস সমাপ্ত ও সার্থক হইয়াছে।—সেই পরিচ্ছেদটি এইরূপ—

"সহস্র দীপের রশ্মিপ্রতিবিম্বসমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে পটমণ্ডপের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবনতুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেবউন্নিসার হাত আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল। . . . .

. . . . "উভয়ে চক্ষুর জল ফেলিল। তখন মবারক ভাবিল, মরিব, না মরিব না? অনেক ভাবিল। সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিত গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল—তাহাতে দীপমালাপ্রভাসিত পটনির্ম্মিত মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া—দূরে পর্ব্বতের চূড়ার উপরে চূড়া, তার উপরে চূড়া—বড় অন্ধকার। দুইজনে বড় অন্ধকারই দেখিল।" ইহার পরের যে ঘটনা তাহাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিয়া উঠিল, "ইয়া আল্লা, আমাকে মরিতেই হইবে।"—চির-অভিশপ্ত প্রেমের এমন লিরিক আর্ত্তশ্বাস, আর কোথাও এমন অপূর্ব্ব নাটকীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে?

তাই বলিতেছিলাম, 'রাজসিংহে' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কবিচিত্তকে পূর্ণ মুক্তি দান করিয়াছেন—উহাতে তাঁহার সেই আদি রোমান্স-রস-প্রেরণা উপন্যাস, নাটক ও গীতিকাব্যের ত্রিধারায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইহার চরিত্র ও চিত্ররচনা অথবা আখ্যান-নির্ম্মাণেও যেমন একটা উদার-স্বাধীন কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দবিহার আছে, তেমনই 'দুর্গেশনন্দিনী'র সেই অর্দ্ধস্ফুট কবিস্বপ্ন নিবিড়-গভীর হইয়া মানব-জীবন-কাব্যের একটা শাশ্বত গীতিসুরকে হৃদয়শোণিতরাগ ও নয়নাশ্রুর অনর্ঘতা দান করিয়াছে,—এই উপন্যাসে কবি আপন কবিহৃদয়ের বিশ্রাম রচনা করিয়াছেন।

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে কবিমানসের অভিব্যক্তি ও তাহারই অনুসরণে তাঁহার কাব্যের ভাববস্তু, তথা কাহিনীগুলির একটা পরিচয় আমি যথাসাধ্য আপনাদের নিকটে নিবেদন করিলাম। অতঃপর সেগুলির সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলিব।

প্রথমে উহাদের রূপ বা রচনাগত আকৃতি-প্রকৃতির কথা। বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি কাব্যরূপ গড়িয়া লইয়াছেন যাহাতে উৎকৃষ্ট কবিকর্ম্মের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে—কাব্য, নাটক ও কাহিনী এই তিনের সুবিধা একাধারে পাওয়া যায়। ভিতরের ছাঁচটা হইবে নাটকের, ডোর হইবে গল্পের এবং ভাবনা হইবে কাব্যের। ইহা হইতে আমরা সাহিত্যসৃষ্টির যে একটি তত্ত্ব উপলব্ধি করি তাহা এই যে, মৌলিক কবিপ্রতিভা নিজের প্রয়োজন-অনুযায়ী কাব্যরূপ নিজেই গড়িয়া লয়, ভাব যেমন মৌলিক, তাহার রূপও তেমনই মৌলিক হইতে বাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে উপন্যাস নাম দিয়া, সেই সংজ্ঞা অনুসারে তাহার দোষ-গুণ বিচার করিলে ভুল হইবে। উহা নাটকও বটে, উপন্যাসও বটে, কাব্যও বটে। তথাপি উহা খাঁটি নাটক নয় এইজন্য যে উহা বিবৃতিমূলক, উহাতে কবির নিজের কথাও আছে; উহা উপন্যাস বা নভেল নয় এইজন্য যে, উহাতে যথাপ্রাপ্ত ও যথাদৃষ্ট

জীবনেরই পরিধিবিস্তার নাই, বরং সেই জীবনকে যেন চোলাই করিয়া তাহার একটা ঘনীভূত নির্য্যাস প্রস্তুত করা হইয়াছে; উহা রীতিমত কাব্যও নয় এইজন্য যে, উহার কল্পনা যতই ঊর্দ্ধগ হউক, তথাপি সর্ব্বদা তাহা বাস্তবের নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা আছে, কাহিনীগুলি ঘটনার কার্য্য-কারণশৃঙ্খলে দৃঢ় গ্রথিত হইয়া আছে। তাহা হইলে উহাদের কি নাম দিব? একজাতীয় কথাকাব্য বলিতে ক্ষতি নাই—কিন্তু তাহাও একটা বিশেষ নামে অভিহিত করা যাইবে না। যাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্রের বাহিরে পদক্ষেপ করিতে ভয় পান, সেই সব পণ্ডিত-সমালোচক উহা-দিগকে কোন একটা শ্রেণীতে না ফেলিতে পারিলে দিশাহারা হইয়া পড়েন; তাহাতে সমালোচনার সুবিধা হয়, কিন্তু কবি ও কাব্যের মুণ্ডপাত করাই হয়। ইদানীং বাংলা সাহিত্যের—আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও—পঠন-পাঠনে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের শাসন যেরূপ অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাতে—বঙ্কিম, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই তিন মহাকবির পিণ্ডোদক-ক্রিয়া অনায়াসে সম্পন্ন হইবে। দুঃখের বিষয়, যে-পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঞ্জীবন মন্ত্রে আমাদের নব্যসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেই সাহিত্যের আচার্য্যগণ সাহিত্য-সমালোচনার যে সকল সুগভীর তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া-ছেন, তাহাতে প্রত্যেক কবিকর্ম্ম একটি স্বতন্ত্র স্বানুরূপ সৃষ্টি, তাহার রূপবিচারে সকল সাধারণ সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানে ইহার অধিক বলা শোভন নয়, বলার অবকাশও নাই; কেবল একটি কথা মাত্র স্মরণ করাইতে চাই। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রকে আমাদের নব্যসাহিত্যের ঐ তিন শ্রেষ্ঠ কবি ও স্রষ্টা সভয়ে দূরে রাখিয়াছিলেন, রাখিয়াছিলেন বলিয়াই নব্য বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল—ইহার মত সত্য কথা আর নাই। কিন্তু বিধাতার এমনই পরিহাস যে, "টকের জ্বালায় যাঁহারা দেশ ছাড়িয়াছিলেন,—তাঁহাদিগকে তেঁতুলতলায় বাসা বাঁধিতে হইয়াছে।"

উপন্যাসগুলির কাব্যরূপ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত; গঠন বা নির্ম্মাণ-কৌশলের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। তথাপি এই প্রসঙ্গে একটা কথাই আবার স্মরণ করাইতে চাই,—এত সামান্য উপকরণ লইয়া, এতবড় কাব্য সৃষ্টি করার যে শক্তি তাহা কি বিস্ময়কর নয়?

বাঙালী-জীবনের স্রোতোহীন পল্বল বা পাড়-বাঁধা নিস্তরঙ্গ দীঘিতে সমুদ্রের অন্তঃস্রোত প্রবাহিত করা—ঐরূপ গ্রাম্য ও নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবনে এমন নাটকীয় ঘটনা-মাহাত্ম্য, এবং এমন নর-নারী-চরিত্রের অবতারণা কতবড় কবিশক্তির নিদর্শন! এ যেন কাণাকড়িতে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান! এ উপন্যাস জীবনের লিরিক-গাথা নয়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক একটা চিকণ সুতার কারুশিল্প নয়, অথবা একটা বড় ভূদৃশ্যের মত কোন সামাজিক জীবনযাত্রার বাস্তব প্রতিলিপিও নয়। ইহা জীবননামে নর-নারীর হৃদিস্থিত সেই দুর্ব্বার কামনা-বাসনার কাহিনী—যাহাতে আমরা একটা দুর্লক্ষ্য, দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির লীলাই দেখিতে পাই; তাহাতে বেগ আছে, সংঘাত আছে, চূড়াকৃতি তরঙ্গের উত্থান-পতন আছে—গতি ও আবর্ত্তন আছে। সেই জীবনকেই বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্য-নাটক-আখ্যায়িকার মিলিতরূপে ধরিয়া দিয়াছেন। অথচ এ সমাজে তাহার ক্ষেত্র কত সঙ্কীর্ণ, উপকরণ কত অপ্রচুর। আরও মনে রাখিতে হইবে, শুধুই জীবনের পটভূমিকা নয়—সাহিত্যের ঐ শিল্পভূমিকাও তাঁহাকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে তখনও প্রকৃত নাটক বা উপন্যাসের জন্ম হয় নাই,—উৎকৃষ্ট নাটকের জন্ম এখনও হয় নাই—এমন কি, বাংলা গদ্যও তখনও সাবালক হইয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় য়ুরোপায় আদর্শের রোমান্স, নভেল ও শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি—এ সকলের উৎকৃষ্ট কাব্যরস একাধারে সৃষ্টি করিতে হইবে! অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভাকে কতবড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

অতঃপর উহাদের অন্তর্গত সেই ট্র্যাজেডির কথা। এইবার তাহারই একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব।

বলিষ্ঠ হৃদয় ও বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা এই দুইটি যেখানেই পুরুষ-চরিত্রে প্রকাশ পায়, সেইখানেই আমরা একটা বিশিষ্ট শক্তির প্রকাশ দেখি। মানুষের জীবনে ঐ শক্তির পূর্ণতম স্ফুরণ হইলে সেই জীবনকে গভীর করিয়া দেখিবার সুযোগ হয়। তুঁষের আগুন বা তৈলহীন দীপশিখা যেমন আগুন বা আলোকের পূর্ণরূপ নয়, সেই রূপ দেখিতে হইলে প্রচুর ইন্ধনের দ্বারা তাহাকে সন্ধুক্ষিত করিতে হয়, জীবনকেও তেমনই, একটা প্রদীপ্ত শিখায় প্রোজ্জ্বল করিতে না পারিলে তাহার পূর্ণায়ত

রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় কবিরা তাহাই করিয়াছেন,—জীবনের সেই গভীরতর, বৃহত্তর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন। একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি, আরেক দিকে মানুষ—সেই একই শক্তি দুইরূপে দুইয়ের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে,—মৃত্যু ও অমৃত, সৎ ও অসৎ, দুইরূপে। প্রকৃতি-শক্তির সৎ-অসৎ নাই, কিন্তু মানুষের জীবনে সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব আছে; বাসনা-কামনারূপিণী সেই শক্তিকে ঐ বিশ্ববিহারিণী শক্তি একটা দুর্জ্ঞেয় নিয়তির রূপে নিষ্ফল করিয়া দেয়। অথচ মানুষের শক্তিও সেই এক শক্তিরই অংশ; অতএব, এ যেন একটা অন্ধলীলা, আপনাকেই আপনি ধ্বংস করিয়া উন্মাদের অট্টহাস্যে করতালি দিয়া উঠে। মানুষের জীবনে শক্তির এই যে নাটকীয় লীলা, ইহারই নাম ট্র্যাজেডি। জীবনকে যদি শক্তির লীলারূপে না দেখিয়া আর কোনরূপে দেখা যায়—করুণ বা মধুর বা শান্তরসের একটি রূপ তাহাকে পরাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা ট্র্যাজেডি হইবে না—তাহার সেই করুণ-রূপ যতই করুণ হউক, তাহাতে ঐ শক্তির প্রকাশ নাই; তাহা কাব্য, নাটক, গাথা, গান, উপাখ্যান—সবই হইতে পারে, কিন্তু যেহেতু তাহাতে শক্তির সেই সংক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বাত্মক রূপ নাই, সেইহেতু জীবনের নিম্নতম গহ্বর ও উচ্চতম শিখর তাহাতে প্রকাশিত হয় না। এমনও বলা যাইতে পারে যে, তেমন কাব্যে একটা মনোগত ভাবের রসাবেশ, বাস্তব সত্য-মিথ্যার ভাবনাহীন একটা চিত্ত-বিনোদনমাত্র আছে, যাহাকে আমাদের আলঙ্কারিকেরা একটু সূক্ষ্ম করিয়া "ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর" বলিয়াছেন; অথবা এমন চিত্র আছে যাহা বাস্তবের একটা উপভোগ্য রূপ মাত্র—যাহাকে কমেডি বলে। কোথাও বা আগুনের আলোকটুকুকে ভাবের রঙে রঙীন করিয়া গীতিকাব্য রচিত হয়।

বলা বাহুল্য যে, ঐ শক্তি মানুষের জীবনে প্রবল প্রবৃত্তির রূপ ধারণ করে, কু বা সু; যে প্রবৃত্তিই হোক—তাহা সেই একই শক্তি। বিশ্ব-প্রকৃতির শক্তি অন্ধ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু মানুষের প্রকৃতিতে উহা আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনার রঙে রঙীন, সুখ-দুঃখের অনুভূতিময়—আত্মসচেতন মানুষের আত্মা ঐ জীবনের ফাঁদে বাঁধা পড়িয়াছে বলিয়াই সেই শক্তি এমন ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিতে পারে। যদি আত্মার ঐ সংস্কারগুলা না থাকিত তবে ঝড় যেমন আপনাকে জানে না, ঐ জীবনও

আপনাকে জানিত না,—একই কালে সে ঐ শক্তির আধার এবং দ্রষ্টা হইতেও পারিত না, কোন জিজ্ঞাসাও থাকিত না—উহার ঐ ট্র্যাজেডি-রূপও তাহার মানসে প্রতিফলিত হইত না। কিন্তু সকল মানুষের কি তাহা হয়? সকলেই কি ঐরূপ দ্রষ্টা হইতে পারে? সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া জীবনকে ঐ রূপে দেখিতে পারাই শ্রেষ্ঠ কবিদৃষ্টি; আর সকল দৃষ্টিই আত্মদৃষ্টি, নিজেরই জবানীতে জগৎকে দেখা; তাহাও একরূপ আত্মদর্শন—জীবনকে দেখা নয়। শেক্সপীয়ারের এই দৃষ্টি যে মাত্রায় ছিল, তেমন আর কোন কবিব ভাগ্যে ঘটে নাই; সেই দৃষ্টিতে জীবনের যে রূপটি ধরা দিয়াছে তাহাই শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির রূপে জগৎ-সাহিত্যে জীবনের একটা গভীর রহস্যময় দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির অন্তর্গত কবিপ্রেরণা আমি যতটুকু নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, তিনিও আদৌ জীবনের ঐ ট্র্যাজেডি-রূপ দেখিয়াছেন। শেক্সপীয়ারের সেই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তিনি দুইটি বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস করিয়াছিলেন—ঐ বিশ্ববিহারিণী প্রকৃতিশক্তি, এবং মানুষের প্রবৃত্তি-জীবন; একটির দুর্জ্ঞেয়তা, এবং অপরটির পারবশ্যতা। প্রত্যক্ষ দর্শনে ঐ ট্র্যাজেডি সত্য—তিনিও তাঁহার উপন্যাসে সেই প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত তিনি শেক্সপীয়ারের অনুগামী। কিন্তু শেক্সপীয়ার যেমন সেই প্রকৃতি-শক্তির লীলারসে মগ্ন হইয়া মানবজীবনের ট্র্যাজেডিকে সকল জিজ্ঞাসা, সকল সংশয়ের ঊর্দ্ধে একটি অবাঙ্‌মনস-গোচর উপলব্ধিতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তেমন বিশুদ্ধ কবিশক্তির বলে ততখানি রসসমাধির অধিকারী হইতে পারেন নাই। ঐ ট্র্যাজেডিকে স্বীকার করিলেও, তিনি অন্ধপ্রবৃত্তির পুরুষ-কারকেই বড় করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনাসক্ত চিত্তে শক্তির লীলাটাই মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই। শেক্সপীয়ার ট্র্যাজেডির ঐ সর্ব্বধ্বংসের মধ্যেও একটা সার্থকতা, জীবনের নিষ্ফলতার মধ্যেও একটা অন্যবিধ কিছুর ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঐরূপ ট্র্যাজেডির অন্তরালে একটা বিরাট্ শূন্যকেই মুখব্যাদান করিতে দেখিয়াছেন; সেই ধ্বংসের ঐরূপ একটা

অর্থ করাও যা, আর শূন্যকেই পূর্ণ করিয়া আশ্বস্ত হইয়াও তাই। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের বোধশক্তি বা রসজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয় না; শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির গূঢ়ার্থ-নির্ণয়ে এখনও পর্য্যন্ত নানা তত্ত্ব ও টীকা-ভাষ্যের অন্ত নাই। আমি বলিব, বঙ্কিমচন্দ্রও শেক্সপীয়ারের একজন স্বাধীন সমালোচক—তিনি তাঁহার সেই রসোপলব্ধির একটা প্রমাণ ঐ উপন্যাসগুলিতে রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার নিজের ট্র্যাজেডি-কল্পনা যতই স্বতন্ত্র হউক, তিনি শেক্সপীয়ারের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে ভুল করেন নাই। অতঃপর আমি বঙ্কিমী ট্র্যাজেডির স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির সহিত তাহার তুলনা করিব, সেজন্য আমাকে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাতেও আমি সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করিব—একজন অতি-প্রসিদ্ধ, আধুনিক শেক্সপীরীয়-সমালোচকের মত উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমের ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব মিলাইয়া দেখিব, তাহাতেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

———

পঞ্চম বক্তৃতা

[বঙ্কিমী-উপন্যাসের ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব ; বঙ্কিমচন্দ্র ও শেক্সপীয়ার ; উপসংহার।]

এইবার সত্যই আমি একটা দুঃসাহসের কাজ করিব,—এমন একটি বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি, যাহা আমার মত অ-পণ্ডিতের রীতিমত অনধিকারচর্চ্চাই বটে, আমি শেক্সপীয়ারের নাটকের ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব সন্ধান করিব, তাহাও আবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে ; এ যেন সেই "আদার ব্যাপারী"র জাহাজের খবর লওয়া। কিন্তু আমি সেই সমুদ্র হইতে আমার ক্ষুদ্র ঘট ভরিবার মত অতি-সামান্যই লইব, শেক্সপীয়ার-সমালোচনার সেই বিরাট্ ভাণ্ডারে প্রবেশ করিব না—মাত্র একজন সমালোচকের দুইচারিটি বাক্যই আমার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ; তাহাও আমি আমার মত করিয়া বুঝিব। অধ্যাপক এ. সি. ব্র্যাডলি তাঁহার "Shakespearian Tragedy" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে শেক্সপীয়ারের নাটক-সমালোচনার চূড়ান্ত করিয়াছেন, আমি তাহারই ছিটা-ফোঁটা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিবার চেষ্টা করিব। অধ্যাপক ব্র্যাডলির সমালোচনায় এমন কয়েকটি কথা আছে যাহা শেক্সপীয়ার সম্পর্কেই পূরাপূরি প্রযোজ্য হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসার অবকাশ তাহাতে আছে। বলা বাহুল্য, আমি অধ্যাপক ব্র্যাডলির শেক্সপীয়ারকে পূর্ণতম শেক্সপীয়ার বলিয়া গ্রহণ করিব না—তাঁহার আলোচনায় কাব্য অপেক্ষা তত্ত্বই বড় হইয়াছে ; ঠিক সেই কারণেই তাঁহার কয়েকটি কথা আমার কাজে লাগিবে, কারণ, আমি এক্ষণে কাব্যরসের পরিবর্ত্তে ট্র্যাজেডির তত্ত্ব-বিচার করিতে বসিয়াছি।

অধ্যাপক ব্র্যাড়লি শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিগুলির এই কয়টি প্রধান লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"Story of exceptional calamity produced by human actions, ending in the death of a man in high estate."

—অর্থাৎ, "একটি অতিনিদারুণ দুর্ভাগ্যের কাহিনী; সেই ঘটনা মানুষের নিজের কর্ম্মফলেই ঘটে, এবং তাহার পরিণামে একজন বড় পুরুষের মৃত্যু হয়।"

অধ্যাপক ব্র্যাডলির মতে—সবচেয়ে বড় লক্ষণ এই যে, ঐ পরিণাম অকারণে বা দৈবকারণে ঘটে না—নায়কের নিজ কর্ম্মই তাহার জন্য দায়ী। কোন দুর্জ্ঞেয় অন্ধনিয়তি সে ট্র্যাজেডির নিয়ন্তা নহে। যদি সেই পুরুষ একটা অসহায় হস্তপদবদ্ধ জীব হইত—বলির পশু হইত, যদি তাহার পৌরুষের পূর্ণস্ফূর্ত্তির অবকাশ উহাতে না থাকিত, তবে দর্শকচিত্তে, দারুণ দুঃখবোধের মধ্যেও নায়কের অসাধারণ শক্তি ও তাহার বীর্য্যের একটি মহিমাবোধ জাগিত না। অতএব, ঐরূপ ট্র্যাজেডির নায়ককে অতিশয় দৃঢ়কর্ম্মা এবং অসীম প্রবৃত্তিবলের অধিকারী হইতে হইবে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক মহাশয় অনেক সূক্ষ্ম বিচারও করিয়াছেন। একথাও বলিয়াছেন যে, ট্র্যাজেডিতে যে একটি ঘটনাশৃঙ্খল গড়িয়া উঠে, তাহাতে কার্য্যকারণের দুশ্ছেদ্য নিয়মও যেমন, তেমনি দৈব বা আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনার যোগও আছে। তথাপি, সেই ঘটনাধারায় নায়কের চরিত্রেরও প্রভাব আছে; অতিশক্তিমান্ নায়কের চরিত্রেও এমন একটি রন্ধ্র থাকে—প্রধানতঃ যাহার জন্যই ঐরূপ পরিণাম অনিবার্য্য হইয়া উঠে। অতএব নায়ক মুখ্যতঃ নিজেরই কার্য্যের ফলস্বরূপ ঐরূপ সর্ব্বনাশের ভাগী হয়; এইজন্য তেমন পরিণামকে এক অন্ধনিয়তির ক্রূর অত্যাচার বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

অধ্যাপক ব্র্যাডলি, অতঃপর ঐ ট্র্যাজেডির জগৎ বা মানব-জীবনের ঐ ট্র্যাজেডি-রূপ আমাদের চিত্তে কোন্ প্রশ্ন উত্থাপিত করে, তাহার মীমাংসাই বা কি, সে সম্বন্ধে অতিগভীর দার্শনিক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ট্র্যাজেডির নায়ককে যতই "স্বকর্ম্মফলভুক্" বলিয়া আমরা সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করি না কেন, তথাপি, উহাতে সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব, এবং তাহাতে অসৎ কর্ত্তৃক সতের ধ্বংসই আপাত-সত্য বলিয়া মনে হয়; এবং তাহার একটা

বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অথচ তেমন ব্যাখ্যা না পাইলে শেষ পর্য্যন্ত ঐ অসৎ বা অমঙ্গলকেই সেই জগতের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নাটকের অভিনয়শেষে আমাদের চিত্তে যে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়—সাধারণ যুক্তিতর্কের ভাষায় যাহা বুঝানো যায় না—তাহাও ঐরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূল নয়; আমরা ততখনি নিরাশ্বাস হইয়া পড়ি না। তাহা হইলে, ঐ শক্তি কেমন শক্তি? উহা নিশ্চয় একটা অধর্ম্ম-শক্তি নয়; কেবল, আমাদের সংস্কারে যে ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ আছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর একটা কিছু নিশ্চয়ই ঐ ট্র্যাজেডির জগৎ শাসন করিতেছে। সেই যে একটা শক্তি, তাহাতে আমাদের ঐ সৎও যেমন, তেমনই অসৎও কোন এক প্রকারে মিলিয়া আছে। এমন কথা বলিলে চলিবে না যে, ডেসডিমোনার মধ্যে যে সৎ রহিয়াছে তাহাই সেই শক্তি, আর ইয়াগোর মধ্যে যে অসৎ রহিয়াছে তাহা সেই শক্তির বহির্ভূত—তাহা ইয়াগোরই নিজের একটা পৃথক শক্তি। অতএব, ঐ অসৎ সেই বিধানের বাহিরে নয়—তাহার অন্তর্গত; সৎ ও অসতের এই দ্বন্দ্ব বা দ্বৈতকে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও সত্য যে, যাহা সৎ তাহা ঐ অসতের দ্বারা নিহত হয় বলিয়া আমাদের চিত্তে একটা বিরাট্ ব্যর্থতাবোধ জাগে।

তথাপি অধ্যাপক ব্র্যাডলির মতে ঐ ট্র্যাজেডির জগৎ অবিচার বা অধর্ম্মের জগৎ নহে—উহা ন্যায়-নীতির জগৎ। তাহা হইলে, অসৎ কর্ত্তৃক সতের ঐ ধ্বংসসাধন—উহার ব্যাখ্যা কি? অধ্যাপক মহাশয় অনেক বিচার-বিতর্কের পর শেষে স্বীকার করিয়াছেন, আমাদের সংস্কার-অনুযায়ী কোনরূপ ব্যাখ্যা অসম্ভব। সর্ব্বশেষে তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়া তর্কের পরিবর্ত্তে কাব্য-প্রয়োজনের দোহাই দিয়াছেন, যথা—

"But should we expect a solution? Shakespeare is not attempting to justify the ways of God to man—to show the universe as a Divine Comedy. Tragedy would not be tragedy if it were not a painful mystery."

অর্থাৎ "ব্যাখ্যারই বা প্রয়োজন কি? শেক্সপীয়ার তো মানুষের প্রতি ভগবানের সুবিচার দেখাইবার জন্য ঐ নাটকগুলি রচনা করেন

নাই—এই সৃষ্টিকে একটা ভাগবতী লীলারূপে প্রতিপন্ন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। ট্র্যাজেডি জাতীয় নাটক যদি একটা দুঃখময় প্রহেলিকাই না হইবে—তবে উহার ট্র্যাজেডিত্ব কোথায়?"

ইহার পর তিনি ট্র্যাজেডির তত্ত্ব এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"We remain confronted with the inexplicable fact or the appearance of a world, travailing for perfection, but bringing to birth an evil, which it is able to overcome only by self-torture and self-waste. This fact or experience is Tragedy."

অর্থাৎ, "আমরা শেষ পর্য্যন্ত যে একটা দুর্ব্বোধ্য সত্যের সম্মুখীন হই তাহা দৃশ্যতঃ এই যে—এই জগৎ যতই একটা পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হইবার আয়াস করিতেছে, ততই অমঙ্গল বৃদ্ধি পাইতেছে; সেই অমঙ্গল নিবারণের জন্য তাহাকে আত্মনিগ্রহ ও আত্মনাশ করিতে হয়।" শেষ পর্যান্ত অধ্যাপক ব্র্যাডলি শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির ব্যাখ্যায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

"The whole order against which the individual part is powerless, seems to be animated by a passion for perfection; there is no other explanation of its behaviour towards evil."

অর্থাৎ—"অংশতঃ বা খণ্ডভাবে সেই শক্তি অক্ষম হইলেও, ইহাই মনে হয় যে, সমগ্রভাবে তাহার অন্তরে পরমোৎকর্ষ-লাভের একটা প্রবল প্রেরণা রহিয়াছে; নহিলে অসৎকে ঐরূপ প্রশ্রয় দেওয়ার অন্য কোন সদুত্তর মেলে না।"

অধ্যাপক ব্র্যাডলির পরে আরেকজন মনীষী সমালোচক শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির যে তত্ত্বটি অতি সংক্ষেপে ও অর্থ-গভীর করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উপরকার ঐ উক্তিটির সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে, যথা—

"The purest reality, the purest beauty, the purest love, cannot by its own nature, manifest itself on earth without disaster, but in disaster it can."

(I. Middleton Murry)

অর্থাৎ, "পরম সৎ, পরম সৌন্দর্য্য, পরম প্রেম—এ সকলের প্রকৃতিই এমন যে, কোন একরূপ সর্ব্বনাশ ব্যতিরেকে ইহারা সংসারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না—ঐ সর্ব্বনাশের দ্বারাই পারে।"

আমার মনে হয়, এই উক্তি আরও যথার্থ,—এইজন্য যে, ইহাতে কোন যুক্তি বা তর্ক নাই, ইহা একটি সহজ উপলব্ধির মত।

অধ্যাপক ব্র্যাডলির মতে, ট্র্যাজেডির জগৎটা একটা 'moral order' বা ন্যায়-বিধানের জগৎ; তাহাতে good ও evil থাকিবেই। কিন্তু evil-এর দ্বারা good যে পরাস্ত হয়, শেষে good ও evil দুইই ধ্বংস হইয়া যায়—তিনি ইহার অর্থ করিতে পারেন নাই; সৎ ও অসতের একটা অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি পরে যথাস্থানে এ সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার আরও কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিব—তিনি বলেন, ঐ ট্র্যাজেডির অভিনয়-দর্শনে এই ভাবগুলি জাগে—(১) "নায়কের অসীম হৃদয়বল ও শৌর্য্যদর্শনে আমাদের প্রাণ যে পুলক-বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়, তাহাতেই সেই দারুণ দুঃখবোধ তুচ্ছ হইয়া যায়। (২) ঐ সকল দেবপ্রতিম মানুষ-বীরের পক্ষে এই জগৎ বড়ই ক্ষুদ্র—যেন একটা কারাগার বলিয়া মনে হয়; মৃত্যুতে তাহারা মহাশূন্যে মিলাইয়া যায় না—মহামুক্তি-লাভ করে; এবং (৩) এই যে সংগ্রাম—এত দুঃখ, এত নিষ্ফলতা, এ সকল মিথ্যা মায়ামাত্র, যেন একটা বিরাট্ দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই শেষের কথাগুলি—ঐ মায়া ও দুঃস্বপ্নের কথা লইয়াই আমাদের কথা আরম্ভ করি। শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির রস-পরিণাম যদি উহাই হয়, তবে ঐ যে ভাবাবস্থার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের শাস্ত্রমতে, উহাই 'শান্তরস'। কারণ, নাটকের অন্তর্গত ঐ প্রাণান্তিক সংগ্রাম ও ঝড়-ঝঞ্ঝার শেষে সে সকলই মায়া বা স্বপ্ন বলিয়া প্রাণ যেন গভীর আশ্বাস অনুভব করে। ঐরূপ রসসৃষ্টিই কি শেক্সপীয়ারের অভিপ্রায় ছিল? তাহা হইলে এত কাণ্ড না করিয়া, একজন সন্ন্যাসী-বৈরাগীকে নাটকের নায়ক করিয়া তিনি অতি সহজেই সেই রস সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ ট্র্যাজেডির নায়ক যে, সে সকল ঝড়-ঝঞ্ঝার উর্দ্ধে অবস্থিত, মহাসংযমী, আত্মজয়ী পুরুষ নয়; তাহার জীবনে, ভিতরে

ও বাহিরে একটা সংগ্রাম চলিতে থাকে, সেই সংগ্রামে তাহার যে শক্তির বিকাশ আমরা দেখিয়া থাকি, এবং শেষ পর্য্যন্ত জয় নয়, পরাজয়ের মধ্যেই তাহার যে অপরাজেয়তা উপলব্ধি করি, তাহাতে শুধুই শান্তরসের উদ্রেক হয় না, সেই শক্তির মহিমাও আমাদিগকে মুগ্ধ এবং উদ্দীপ্ত করে, আমরাও নায়কের মারফতে একটা আত্মগৌরব—মানবাত্মার অসীম গৌরব অনুভব করি ; ইহাই ঐ ট্র্যাজেডির মুখ্য রসপ্রেরণা।

শ্রুতি যে বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—তাহার অর্থ, আত্মাকে যখনও লাভ করা যায় নাই, ততক্ষণ ঐ বল বা শক্তির সাধনা, ততক্ষণই বলের পরীক্ষা ; লাভ হইয়া গেলে সেই আত্মা নিষ্কাম ও নিস্পৃহ হইয়া, এই জীবন ও জগতের রণক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহাকে জীবনের সহিত আর কোন সম্পর্ক করিতে হয় না। ভারতবর্ষ সেই শক্তির সাধনায়, প্রথম হইতেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া একটা ভিন্ন পন্থায় আত্মাকে লাভ করিবার উপায় সন্ধান করিয়াছিল ; য়ুরোপ এই জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া, দেহমনের যতকিছু উৎপাত-উপদ্রবকে নির্ভীকভাবে বরণ করিয়া, সেই শক্তিকে আর এক পন্থায় পূর্ণ প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে—আত্মাকে লাভ করিতে না পারিলেও জীবনকে জয় করে, পুরুষের সেই পৌরুষ-মহিমার দ্বারাই আত্মার বরমাল্য রচনা করে। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিতে পুরুষের পরুষ-আত্মার সেই জয়ঘোষণা আছে ; এই দেহাধিষ্ঠিত প্রাণ-মনের যতকিছু প্রবৃত্তি ও পিপাসা, ভ্রান্তি ও মোহ, রিপুর উন্মত্ত আক্ষেপ প্রভৃতির মর্ম্মান্তিক পীড়নে পুরুষের সেই শক্তি—তাহার সেই দুর্জয়তা—ধ্বংস ও মৃত্যুর অগ্নিশিখায় ভাস্বর হইয়া উঠে। সেই শক্তির স্ফুরণে কু বা সু বলিয়া কিছু নাই, আত্মার সেই সংগ্রাম-শক্তির পক্ষে দুইয়েরি মূল্য সমান ; একমাত্র সত্য বা সৎ—পুরুষের সেই আত্মবল। শেক্সপীয়ার ঐ শক্তিকে—বলীয়ান্ আত্মার সেই বলকে—জীবনের জবানীতে, দেশ-কাল ও পাত্রের বিবিধসজ্জায়, নর-নারীর দেহ-মনের বিচিত্র ও অন্তর-গভীর ভঙ্গিমায়, যতকিছু নির্ব্বন্ধ ও প্রতিবন্ধের জটিল জালবেষ্টনীতে রূপায়িত করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত সেই পুরুষ-আত্মার মহত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। জীবনের অর্থ করিতে হইলে ঐ আত্মার দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে ; সেই দৃষ্টি তিনি তাঁহার নাটকগুলিতে

স্বয়ম্প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বাক্যার্থের গোচর নয়—অন্তর-গোচর, তাই তাহার অর্থ করিতে গিয়া অনর্থের অন্ত নাই।

অধ্যাপক ব্র্যাডলিও অর্থ করিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। ইহার কারণ, তিনি ঐ শক্তিকে সর্ব্বসংস্কারমুক্ত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই; সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়ের যে অতিদৃঢ় নীতি-সংস্কার খৃষ্টান য়ুরোপের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা তিনি বর্জন করিতে পারেন নাই; যদি পারিতেন তাহা হইলে, ঐ সৎ ও অসৎ good and evil-এর দ্বন্দ্ব লইয়া মাথা ঘামাইতেন না; যে-শক্তি সৎও নয়, অসৎও নয়, যাহা আমাদের ঐ সত্য ও মিথ্যাকে সমান উপহাস করিয়া, তাহারই মায়াজালে পুরুষকে জড়াইয়া, সেই জাল ছিঁড়িয়া ফেলিতে আহ্বান করিতেছে, এবং বলহীনকে বাঁধিয়া রাখিয়া বলবান্‌কে মুক্তি দিতেছে, সেই শক্তিকে তিনি শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির রসরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বসংশয়মুক্ত হইতেন। তিনি frustration ও waste-ও যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তেমনই moral order এবং justiceকেও তাঁহার চাই। Evil এবং good-এর দ্বন্দ্বে evil জয়ী হয়, এবং শেষে দুই-ই ধ্বংস হইয়া যায়—এমন একটা তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়াও তিনি বলিতে পারেন নাই যে, ঐ দুই-ই অসৎ, কোনটাই সত্য নয়। ঐ সৎ ও অসৎ—good and evil -এর একমাত্র মূল্য এই যে, ঐ দুইটার সংঘাতে যে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সেই পুরুষ-আত্মার বৈশ্বানর-রূপ পূর্ণপ্রভায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সত্য একমাত্র সেই বলীয়ান্ আত্মা, যে সৎ-অসতের কোনটাকে গ্রাহ্য না করিয়া, উদ্দাম অন্ধপ্রবৃত্তির আগুন জ্বালাইয়া, সেই আগুনেই সকল দুর্ব্বলতা ও অশুচিতা ভস্ম করিয়া ফেলে। ম্যাকবেথের অনুশোচনাই সেই প্রবৃত্তিকে অন্ধ করিয়া তোলে; ওথেলোর প্রেম মাত্রাতিরিক্ত হইয়া বিপরীত রিপুর অনলদাহে তাহাকে জ্যোতিষ্মান করিয়াছে। হ্যামলেটে সেই শক্তি জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রবল ধিক্কারে অন্তর্নিরুদ্ধ হইয়া, একটা আকস্মিক বিস্ফোরণে আত্মাকে মুক্ত করিয়া দেয়। অ্যান্টনিতে দেহাধিষ্ঠিত কামই শ্মশানচারী মহেশ্বরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি সেই বলীয়ান্ আত্মার মহিম্নস্তব।

(২)

কিন্তু আত্মার ঐ জয়লাভ তো জীবনকে আড়াল করিয়া নয়, বরং ঐ দেহ—ঐ জীবনকে আশ্রয় করিয়াই তাহার সেই শীর্ষ এত উর্দ্ধে উঠিতে পারে। তৎসত্ত্বেও শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডিতে জীবনের দিক দিয়া একটা মহাশূন্যই অবশিষ্ট থাকে। শেক্সপীয়ারই এই জীবন ও জগতের যে অসীম সম্পৎশোভা—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ—দুই জগতেরই শোভা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তেমন আর কোন কবি পারেন নাই ;—মানবজীবনের উর্দ্ধ ও অধস্তল এমন করিয়া আর কেহ আমাদের দৃষ্টিগোচর করেন নাই। তথাপি ঐ ট্র্যাজেডিগুলিতে সেই জীবন শেষে একটা অলীক মায়া, একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়া যে মনে হয়, ইহাও সত্য। তবে কি জীবনের কোন মূল্য নাই? শেক্সপীয়ার সেই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই। এইজন্য কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড শেক্সপীয়ারের উদ্দেশে বড় যথার্থ কথা বলিয়াছেন—

> "Others abide our question—Thou art free !
> We ask and ask—Thou smilest and art still,
> Out-topping knowledge."

শেক্সপীয়ার যেন সকল প্রশ্নের উত্তর আমাদের অনুভূতির উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি জীবনকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাঁহার মত বিশুদ্ধ কবিদৃষ্টি আর হইতে পারে না। সেই দেখা তিনি আমাদিগকেও দেখাইয়াছেন ; কিন্তু তাহার পরে কি ? ততঃ কিম্ ? ঐ যে অসীম সম্পৎশোভা জীবন আমাদের সম্মুখে বিস্তার করে, উহার এমন ব্যর্থতা, এমন অন্তহীন অপচয় বিশ্ববিধানের অনুমোদিত নয় বলিয়াই একটা সংশয় জাগে। শেক্সপীয়ার যেন সেই প্রশ্নটাকে চির-উদ্যত রাখিয়াছেন—সেই প্রশ্নকাতরতা ও উত্তরের পিপাসা তাঁহার ঐ নাটকের কাব্যরসকে এমন গভীর করিয়া তোলে। এইজন্য ঐ রস আমাদের 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' সেই রসের মত সমাধি-রস নয় ; সে কাব্য জীবনের ঐ বিশাল বিরাট্ বাস্তবকেই সেই প্রশ্নের রসে, অসীম ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করিয়াছে। ঐ জীবন হইতেই তিনি এমন একটা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা জীবনের গণ্ডিকে ছাড়াইয়া গেলেও, জীবনই

তাহার মূল। আবার, কোন তত্ত্ব—নীতি বা ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের পক্ষপাত নাই বলিয়াই উৎকৃষ্টতম কাব্যহিসাবে উহা অতুলনীয়। ঠিক সেই কারণেই—অর্থাৎ, উহা বিশুদ্ধতম কাব্য বলিয়াই জ্ঞানী-ঋষিদের চক্ষে মূল্যহীন। ঋষি টলষ্টয় শেক্সপীয়ারের নাটককে মানুষের ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অতিশয় অস্বাস্থ্যকর কুপথ্য বলিয়া ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। ঋষি এমার্সনও (Emerson) শেক্সপীয়ারের কবিপ্রতিভার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়া অবশেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঋষি-মনীষীদের না বলিয়া উপায় নাই ; তিনি বলিয়াছেন—

"And now, how stands the account of man with this bard and benefactor, when in solitude, shutting our ears to the reverberations of his fame, we seek to strike the balance?" (*Representative Men*)

অর্থাৎ—"মানুষের জীবনের একটা হিসাব মানুষের সুহৃদ্ এই মহাকবি কেমন দিয়াছেন ? যখন, তাঁহার জগৎব্যাপী-প্রশংসার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে কর্ণ রুদ্ধ করিয়া আমরা নির্জনে সেই জমা-খরচের খতিয়ান করি, তখন কি দেখিতে পাই ?"

"Shakespeare, Homer, Dante, Chaucer saw the splendour of meaning that plays over the visible world. . . .

Shakespeare rested in their beauty and never took the step which seemed inevitable to such genius, namely, to explore the virtue which resides in these symbols."

অর্থাৎ—শেক্সপীয়ার এই জগতের উপরকার দৃশ্যগুলিই দেখিয়াছেন—সেই সাঙ্কেতিক লেখাগুলি পড়িয়াছেন মাত্র, তাহাদের গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করেন নাই।

"As long as the question is of talent, and mental power, the world of men has not his equal to show. But when the question is to life, and its materials and its auxiliaries, how does he profit me? What does it signify?"

অর্থাৎ—"প্রতিভা ও মনীষায় মানুষের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়,

কিন্তু যখন এই জীবনের অর্থ জানিতে চাই তখন তাঁহার এই কাব্যগুলি আমার কোন্ কাজে লাগিবে? তাহাদের মূল্যই বা কি?"

এমার্সন এমনও বলিয়াছেন যে, শেক্সপীয়ার জগতের প্রমোদ-শালায় উৎসবের আয়োজনকর্ত্তা মাত্র—"He was master of the revels to mankind"; তাঁহার ঐ কাব্যগুলির এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে—"very superior pyrotechny this evening"; অর্থাৎ "অদ্য রজনীতে অত্যুৎকৃষ্ট আতসবাজি দেখানো হইবে।"

আমি এমার্সনের উক্তি একটু সবিস্তারেই উদ্ধৃত করিলাম, তার কারণ, তাঁহার এই মত যেমনই হোক—ঐ যে প্রশ্ন তিনি করিয়াছেন—তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-জিজ্ঞাসার মত, যদিও সেই জিজ্ঞাসার উত্তর না দেওয়ার জন্য বঙ্কিম শেক্সপীয়ারকে দায়ী করেন নাই। এমার্সনের ঐ উক্তিগুলি হইতে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, যে-কবি সেই রসব্রহ্মকে সৃষ্টির এই অনন্ত বৈচিত্র্য ও বহু রূপের মধ্যেই আস্বাদন করিয়াছেন—সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের মধ্যেই সেই দ্বন্দ্বাতীতকে আমাদের অন্তরগোচর করিয়াছেন, তাঁহাকেও মানুষ এই কারণে সত্যদর্শী বলিয়া স্বীকার করে না যে, তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই মর্ত্ত্যজীবনকে মহিমাদান করেন নাই, বরং জীবনকে পূর্ণ-উদ্‌ঘাটিত করিয়াই, তাহা যে কত অন্তঃসারশূন্য এমনই একটা ধারণা সৃষ্টি করিতে চান। কিন্তু ইহাও সত্য নয়—অর্দ্ধসত্য; তিনি যদি জীবনকে অতখানি নস্যাৎ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ কাব্যগুলি মোহমুদ্গরের মতই যোগী-সন্ন্যাসীদের পাঠ্য হইয়া থাকিত। শেক্সপীয়ার মানবজীবনের কোন অর্থ করিতে না চাহিলেও, তাহার যে একটি রূপ ঐ নাটকগুলিতে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা শুধু চমকপ্রদ নয়—সত্য; তিনি মায়াবাদী বৈদান্তিক নহেন—প্রকৃতিবাদী তান্ত্রিক। ধরিত্রীর উপরকার শ্যামশষ্পাবরণের তলে ভূগর্ভস্থ অনলপ্রবাহের মত, জীবনের মূলে তিনি প্রবৃত্তির যে ভৈরবী-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মত পরম-বাস্তব আর কি হইতে পারে? মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা কতকগুলা অভ্যস্ত সংস্কারের দ্বারা তিনি সেই বাস্তবের ব্যাখ্যা করিতে চাহেন নাই, বরং সে আপনাকে আপনিই ব্যাখ্যা করুক—ইহাই ছিল তাঁহার কবিমানসের নিশ্চিন্ত অভিলাষ। উহার

পরেও যদি কোন প্রশ্ন জাগিয়া থাকে তবে সে দায়িত্ব তাঁহার নহে; সকল তত্ত্বকে নিরস্ত করিয়া সে প্রশ্নেরও সমাধান হইবে অন্তরে—শেক্সপীয়ারের নাটক ও তাহার দর্শকের মধ্যে কোন ব্যাখ্যাকার দাঁড়াইবে না; অভিনয়ই উহার একমাত্র ব্যাখ্যা। উহার সমালোচনাও উহাকে রূপময় করিয়া দেখানো; রূপকে রূপের দ্বারাই বুঝাইতে হয়। আর এক উপায় আছে—উহার ঐ রসকে আর এক পাত্রে ঢালিয়া আরেক রূপে আস্বাদন করা, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন—তাঁহার উপন্যাস-গুলিতে তিনি উহা নিজের মত করিয়া আস্বাদন করিয়াছেন।

(৩)

আমি অধ্যাপক ব্র্যাডলির উপরেও এই যে একটু তত্ত্বালোচনা করিলাম, ইহা আমার পক্ষে—অর্থাৎ এই নিতান্তই বাংলা-সাহিত্য-ব্যবসায়ীর পক্ষে দুঃসাহসিক, এমন কি স্পর্দ্ধাপূর্ণ হইলেও, ইংরেজীর অধ্যাপকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। উপায় নাই, আমি এমনই অনাচারী যে, একদিকে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের 'রস-পণ্ডিত' এবং অপর দিকে 'ইঙ্গ-বঙ্গীয়', অর্থাৎ আধাফেরঙ্গ-পণ্ডিত উভয়ের নিকটে সমান অপাংক্তেয়। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের মত শক্তিমান্ ও উচ্চাশয় কবি যে শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির মধ্যে তাঁহার নিজস্ব কল্পনার পুষ্টি ও পাথেয় সংগ্রহ করিবেন, তাহা কেবল ঐ ব্যক্তির পক্ষেই নয়—যুগের পক্ষেও স্বাভাবিক। আরও বড় কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই রেণেসাঁসের অধিনায়ক—কবি ও ঋষি। সেই রেণেসাঁসের প্রধান ভাবভিত্তি ছিল—মানব-জীবনের মহিমাবোধ; কিছুতেই, কোন আধ্যাত্মিক আদর্শকে বড় করিয়া, এই দেহজীবনের—মানুষের এই মর্ত্ত্যলীলার গৌরব লাঘব করা যাইবে না। শ্রুতি যাহাকে মৃত্যু বলিয়াছেন—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"—নর-জীবনের সেই যতকিছু সঙ্কট, দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনাকেই, জ্ঞানের নয়—প্রেমের—মনুষ্য-হৃদয়ের সেই অসীম পিপাসার অনুরঞ্জনে অমৃতে পরিণত করিতে হইবে; উহাই একাধারে বিদ্যা ও অবিদ্যা। কবি-বঙ্কিমের

ইহাই ছিল অন্তরের অন্তরতম আকুতি। সেইজন্য তিনি জীবনের—উপরিতলের বিস্তারে নয়, গভীরতম তলদেশে সেই সঙ্কট—সেই মৃত্যুর প্রকৃত রূপ সন্ধান করিয়াছিলেন। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিতে তিনি সেই মৃত্যুকে বিবিধ রূপে দেখিয়াছিলেন, এবং স্বকীয় প্রতিভা ও কবিপ্রকৃতির অনুযায়ী তাহার একটা তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এখানে বঙ্কিমের নিজেরই যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে দুইটি বস্তুর প্রমাণ আছে—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমানসে শেক্সপীয়ারের প্রভাব; (২) সেই শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির তিনি একটা অর্থও করিয়াছেন। কথাগুলি এই—

"এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি—সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে-আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই তাহাতো পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্য-দেবের ন্যায় ধর্ম্মকে মানসনেত্রে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়—সক্রেতিস, গ্যালিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন, জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত 'Paradise Lost'। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেণ্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ 'আণ্টনি, ক্লিওপেট্রা'। রূপ-বহ্নির 'রোমিও ও জুলিয়েত', ঈর্ষা-বহ্নির 'ওথেলো'। . . . . স্নেহ-বহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহজন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি

মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?" [কমলাকান্ত]

—উপরের ঐ কথাগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যজীবনের ঐ ট্র্যাজেডিকে পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিয়াছিলেন—ঐ বহ্নির আরতি তিনিও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঐরূপ দগ্ধ হওয়ার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই—বরং সেই বহ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাচের আবরণ চাহিয়াছেন। তিনি সেই ট্র্যাজেডির রসাস্বাদ করিয়াই চরিতার্থ হইতে পারেন নাই। তার কারণ—তাঁহার সেই মর্ত্ত্যজীবন-প্রীতি, মৃত্যুকেই জীবনের আজ্ঞাবহ করিবার আকাঙ্ক্ষা। তিনি শেক্সপীয়ারের নাটকে সেই প্রবৃত্তির—সেই বহ্নির লীলা গভীর করিয়াই দেখিয়াছিলেন, শেক্সপীয়ারের দৃষ্টিই পূরাপূরি অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিরাশ হইতে চান নাই, ঐ মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার একটা বড় উপায় আছে, এ বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই। আমরা সে প্রয়াস দেখিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রবৃত্তি ও তাহার পরিণাম কোনটাকে ছোট করেন নাই—বরং পুরুষ-জীবনের সেই শোকাবহ নিষ্ফলতাই তাঁহার কবিজীবনকে অভিভূত করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রবৃত্তিজীবনেরও মূল সন্ধান করিয়াছিলেন—একেবারে সৃষ্টির আদি-রহস্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তিময় জীবনের দ্বন্দ্বকে তিনিও বড় করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু আরও গভীরে। উহা সেই প্রবৃত্তি, যাহার মত প্রবল ও সর্ব্বগ্রাসী, পুরুষের জীবনে—মহদাশয় পুরুষের জীবনেও—আর কিছু হইতে পারে না; সৃষ্টির আদি-প্রবৃত্তিও তাহাই। তিনি সেই কামপ্রেমের দ্বন্দ্বকেই—দেহ-আত্মার দ্বন্দ্বরূপে, মানুষের প্রবৃত্তিজীবনে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, এবং উহাতেই যে জয়লাভ, তাহাকে, অর্থাৎ প্রেমকেই মৃত্যুর একমাত্র পরম ঔষধ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এ প্রেম জীবনেরই দান, অতএব জীবন মূল্যহীন নহে। আর সকল প্রবত্তিই রিপুমাত্র; কিন্তু এই যে প্রবৃত্তি, ইহাতে আত্মার সহিত দেহের দ্বন্দ্ব প্রথম হইতেই বিদ্যমান থাকে—কোথাও সজ্ঞানে, কোথাও অজ্ঞানে। এক 'ম্যাকবেথ' ছাড়া শেক্সপীয়ারের

সকল বড় ট্র্যাজেডিতেই ঐ আত্মার পিপাসা—ঐ প্রেমই কতরূপে, কত অবস্থায় বিকারপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে। সর্ব্বত্র তাহা সমান প্রাধান্য লাভ করে নাই বটে—কোন একটা অপর প্রবৃত্তির বেগ প্রবল হইয়াছে, কিন্তু আরও গভীরে উহাই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। 'হ্যামলেটে' এই প্রেম অন্তর-রুদ্ধ; 'ওথেলো'য় মুগ্ধ, আত্ম-বিড়ম্বিত; 'আণ্টনি'তে আত্মঘাতী; 'লীয়রে' উহাই রূপান্তরিত।

ঐ এক প্রবৃত্তিকে বড় করিবার আরও কারণ—তিনি যেমন পুরুষকেই সেই আত্মিক পিপাসায় কাতর করিয়া ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বকে বাহির হইতে আরও ভিতরে লইয়াছিলেন, তেমনই শুধুই পুরুষের শক্তি নয়—তাহার সহিত নারীর শক্তিকেও জীবনে একটা বড় স্থান দিয়াছিলেন। ঐ দৃষ্টি আমাদের দেশেই সম্ভব। পুরুষের অন্ধপ্রবৃত্তির বেগ আমাদের জীবনে ঐ নারীর দ্বারাই অনেক পরিমাণে দমিত ও প্রশমিত হয়; তাহার মোহিনী কামিনী-মূর্ত্তিও যেমন পুরুষের সেই আদি-প্রবৃত্তির ইন্ধন, তেমনই তাহার যে সর্ব্বংসহা স্নেহময়ী, কল্যাণী মূর্ত্তি, তাহাও পুরুষের প্রমত্ততাকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ করে। তেমন মূর্ত্তি য়ুরোপের উন্মাদা-প্রকৃতির লীলায় সাধারণতঃ সুগোচর হইয়া উঠে না। অতএব, বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির সেই কাঠামোখানা, সেই বাস্তব-গভীর প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও তাহার পরিণাম, এবং ঐক দুর্জ্ঞেয় নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য শাসন—এই কয়টিকে আশ্রয় করিয়া যে নূতনতর ট্র্যাজেডি রচনা করিলেন, তাহার মূল লক্ষণ হইতেছে এই দুইটি : প্রথম, পুরুষের অন্ধপ্রবৃত্তি নয়, অতিশয় আত্মসচেতন—এবং সেই কারণেই আরও দুর্ব্বল, আরও অসহায় সেই কাম-প্রেমের দ্বন্দ্ব। আর সকল প্রবৃত্তির উপরে তিনি যে ঐ কাম-প্রেমের প্রবৃত্তিকে মুখ্য করিয়াছেন, তাহাতে জীব-জীবনের সেই মূল নিয়তিকে যেমন বরণ করা হইয়াছে, তেমনই, জীবনকে, শেক্সপীয়ারের মত, একটা আত্মজ্ঞানহীন দুর্ব্বার প্রবৃত্তি-লীলার দুর্ভেদ্য রহস্যরূপে উপস্থাপিত করা হয় নাই; শুধুই প্রকৃতি-পারবশ্য নয়, পুরুষের সচেতন আত্মানুভূতিও তাহাতে আছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সেই শক্তির লীলায় নারীকে একটা বড় অংশের অধিকারিণী করিয়াছেন, তাই তাঁহার ট্র্যাজেডিতে নায়কের যে পরিণাম

সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কেবল নায়কের কর্ম্মফলই নহে, তাহাতে নায়কের কর্ত্তৃত্বাভিমানই প্রবল হইতে পারে নাই। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-ট্র্যাজেডিতে অধ্যাপক ব্র্যাডলি-ধৃত সেই শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়া দেখিব।

এই সংজ্ঞা-অনুযায়ী এখানেও একটা শোকাবহ পরিণাম আছে, এবং তেমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। সেই পরিণাম নায়কেরই পরিণাম—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও তাহাই। নায়ক একজন উচ্চস্থানীয় ব্যক্তি হইবে; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক রাজা, রাজপুত্র বা খুব বড় ইতিহাস-প্রথিত বীর না হইলেও, সকলেই সাধারণ হইতে উচ্চস্তরের পুরুষ। তারপর, ঐ নায়কের মৃত্যু হওয়া চাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি-কল্পনায় ঐরূপ মৃত্যু অত্যাবশ্যক নয়, এইখানে কল্পনার একটা মূলগত পার্থক্য আছে, পরে তাহা দেখিব। অধ্যাপক ব্র্যাডলি আরও একটি বিশেষ লক্ষণ উহাতে যোগ করিয়াছেন—সেই পরিণামের যে ঘটনা-শৃঙ্খল, তাহা মুখ্যতঃ নায়কেরই শক্তি ও অশক্তির দ্বারা গঠিত হয়, অর্থাৎ কোন দৈব বা নিয়তির দাস সে নহে। এইখানেই সবচেয়ে বড় পার্থক্য; বোধ হয় এই একটি কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি অতিশয় স্বতন্ত্র। কিন্তু শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির এই যে কয়েকটি লক্ষণের উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে, ইহা দ্বারা ঐ ট্র্যাজেডিগুলিকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া বিচার করা হইয়াছে। সেইরূপ বিচারের সাহিত্যিক প্রয়োজন যেমনই থাকুক, তাহাতে শেক্সপীয়ারের কবিকল্পনাকে গণ্ডিবদ্ধ করা হয়। কারণ, যদি তাহাই হয়, তবে শেক্সপীয়ারের দৃষ্টি ব্যাপকভাবে মানবজীবনের উপরে প্রসারিত হয় নাই, তিনি এক শ্রেণীর ট্র্যাজেডিমাত্র রচনা করিয়াছেন, জীবনকে সেই ট্র্যাজেডির গণ্ডিমধ্যে দেখিয়াছেন। একটা ছাঁচ বা আদর্শ তাঁহার মনে নিশ্চয় ছিল, কিন্তু সেই ছাঁচের মধ্যেই কি তাঁহার মুক্ত-স্বাধীন কবি-দৃষ্টি জীবনকে ব্যাপক ও পূর্ণতররূপে দেখে নাই? যে কর্ম্ম মানুষ স্বেচ্ছায় করে তাহাই কি শেষে তাহার একটা বড় বন্ধন হইয়া দাঁড়ায় না?—তাহার সেই কর্ত্তৃত্বের প্রতিবন্ধক হইয়া সেই কর্ম্মই তাহার একরূপ নিয়তি হইয়া উঠে না? একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখিকাও লিখিয়াছেন—

"Our deeds are like children that are born to us; they live and act apart from our own will; nay, children may be strangled, but deeds never." (George Eliot: *Romola*)

অর্থাৎ—"সন্তান যেমন পিতামাতা হইতে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে, তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করে না, আমাদের স্বকৃত কর্ম্মগুলাও সেইরূপ; একবার করিয়া ফেলিলে তাহার উপরে আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। সন্তানকে যদি বা শিশু-অবস্থায় হত্যা করা যায়—কর্ম্মকে হত্যা করিবে কে?" আমাদের ঋষিরাও বলেন, "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" অতএব শক্তিমান্ পুরুষের জীবনেও স্বকর্ত্তৃত্বের অধিকার সীমাবদ্ধ। ঐ কৃতকর্ম্মগুলার যে বন্ধন তাহাও একপ্রকার destiny বা অদৃষ্ট। শেক্সপীয়ারের মত কবি যে তাহাকে কোথাও অস্বীকার করিবেন—এমন হইতে পারে না। তাঁহার নাটকগুলি পড়িলে কি মনে হয় না যে, নায়কের সেই পুরুষকার যত বড়ই হউক, তাহার ভিতরেও যেমন, বাহিরেও তেমনই, নিষ্ফলতার বীজ উপ্ত হইয়া আছে? নিয়তি, দৈব ও কৃতকর্ম্মগুলার নিজস্ব স্বাধীন গতি—এ সকলই সেই পরিণামের নিয়ামক নহে কি? বরং এতগুলা মিলিয়াই তো সেই পরিণামকে আরও ভয়াবহ করিয়া তোলে। এতগুলা কারণের মিলিত ফল যাহা, পুরুষের আত্মবল যে তাহারও অধিক—ইহাই তো তাহার গৌরব; ইহাই তো শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির আধ্যাত্মিক সঙ্কেত।

কিন্তু য়ুরোপীয় জীবনে ঐ প্রবল প্রবত্তিমূলক পুরুষকার এতই প্রত্যক্ষ—শেক্সপীয়ারের নাটকেও তাহাই হইয়াছে—যে, সেই কারণেই morality বা সু ও কু-এর সংস্কার সেখানকার চিন্তায় একরূপ দুর্লঙ্ঘ্য বলিলেই হয়; তাই অধ্যাপক ব্র্যাডলি শেক্সপীয়ারের সেই সর্ব্বসংস্কারমুক্ত কল্পনার একটা 'moral' অর্থ না করিয়া সুস্থ হইতে পারেন নাই। ঐ যে নায়ক তাহার স্বকর্ম্মেরই ফলভোগ করে, তাহার ভাগ্যের অধিপতি সে নিজেই—সে নিজের শাস্তি নিজেই বহন করে, তাহাতেই পুরুষের দুর্জয় আত্মাভিমানের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অন্যরূপ বুঝিয়াছিলেন, তিনি, ঐরূপ moral নয়—spiritual বা গভীরতর আত্মিক সিদ্ধিলাভকেই পুরুষের গৌরব বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার উপন্যাসগুলিতে, নায়ক-পরুষকে

ঐ একটি সঙ্কটে, অর্থাৎ—অপরা শক্তি যে নারী, তাহার সহিত আত্মিক কাম-প্রেমের দ্বন্দ্বে, চরিত্রগুলিকে ও অবস্থাগত বিভিন্ন সংস্থানে স্থাপিত করিয়া, এক নূতনতর ট্র্যাজেডি রচনা করিলেন। সেই ট্র্যাজেডি দুই কারণে শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি হইতে স্বতন্ত্র: প্রথম, শেক্সপীয়ার বঙ্কিমচন্দ্রের মত কোন জিজ্ঞাসা বা সমস্যার চিন্তা করেন নাই; তাই তাঁহার কাব্য সৃষ্টিকাব্যের মতই সীমাহীন রহস্যের আধার হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ একই কারণে, বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়ারের মত নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই,—তাঁহার উপন্যাসগুলিতে নায়ক-জীবনের যে ট্র্যাজেডি আছে তাহার সহিত নিজের ব্যক্তিহৃদয়ের উৎকণ্ঠাও যুক্ত হইয়াছে; আমি সেই উপন্যাসগুলিতে তাঁহার কবি-মানসের অভিব্যক্তির যে ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা এই কারণেই সম্ভব হইয়াছে। এই দুই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে শেক্সপীরীয় নাটকের মত অত্যুৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনার অবকাশ ঘটে নাই।

অতঃপর আমি বঙ্কিমচন্দ্রের একখানিমাত্র উপন্যাস হইতে বঙ্কিমী ট্র্যাজেডির স্বরূপ সন্ধান করিব।

'বিষবৃক্ষে'র নায়ক নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া 'বিষবৃক্ষ' কি বঙ্কিমী আদর্শের একখানি উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি নয়? শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির অধ্যাপক ব্র্যাডলি-ধৃত সংজ্ঞা-অনুসারে উহা সত্যকার ট্র্যাজেডি নয়, কারণ, উহার নায়ক যে অতবড় আত্ম-পরাজয় বা দুষ্কৃতি-চেতনার পরেও বাঁচিয়া থাকিতে পারিল, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, উহার সেই ট্র্যাজেডি-সম্মত চরিত্রমহিমা নাই; সে যেন সংসারের সহিত—সেই দুর্ভাগ্য-শক্তির সহিত সন্ধি করিয়া তাহার ঐ ঘৃণ্যতম পরাজয়কে মানিয়া লইল। কিন্তু এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে, মৃত্যু-বরণই পুরুষ-আত্মার একমাত্র গৌরব নয়—তাহাতে পুরুষের যে জয়লাভ হয় তাহাই আত্মার নিঃশ্রেয়স নয়—অন্য গৌরবও আছে, প্রেমের নিকটে আত্মসমর্পণের গৌরব। 'বিষবৃক্ষে'র যে ট্র্যাজেডি তাহাতে শেক্সপীরীয় লক্ষণও যেমন আছে, তেমনি সেই ট্র্যাজেডির বিষ-বিসর্পের অতিসান্নিধ্যে কবি একটি অমৃত-বর্ত্তিকাও স্থাপন করিয়াছেন—সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেম; সেই অমৃতই নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু-নিবারণ করিল। কাহিনীর ঐ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে কবি-বঙ্কিম মানব-মানবীর

হৃদয়-সাগর মন্থন করিয়া, দারুণ বিষ ও শীতল অমৃত দুই-ই প্রবাহিত করিয়াছেন; তাহাতে আর কিছু না হোক, মানুষের জীবন-সত্যকে একটা পূর্ণতর রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অথচ ট্র্যাজেডির ভীষণতা তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং আরও দীপ্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পাঠান্তে, একদিকে কুন্দ ও হীরা, এবং অপরদিকে সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ, এই দুইয়ের কোনপক্ষের পরিণাম কম শোচনীয় বলিয়া মনে হয় না। একদিকে হীরার প্রবল প্রবৃত্তিবেগ, নারী-হৃদয়ের সেই বিপ্লবাগ্নি, অপরদিকে, আর দুই নর-নারীর—উভয়েরই ক্ষণিক আত্মভ্রষ্টতা, এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া, এক অতি নিরপরাধ, অতিসরল, কুসুম-কোমল মানব-দুহিতার যে হৃদয়ভেদী পরিণাম তাহার মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ট্র্যাজেডি আর কি হইতে পারে? শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির তুলনায়, এই উপন্যাসের অতিসামান্য—নিতান্তই এক ক্ষুদ্র পরিবেশে, আমরা যে ঘটনা-চরিত্র ও নিয়তি-জটিল কাহিনীজাল রচিত হইতে দেখি, তাহাতে সেই শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি-রস মাত্রাভেদে নিশ্চয় আছে, উপরন্তু আরও কিছু আছে; উভয়ে মিলিয়া এমন একটি রসের সৃষ্টি হইয়াছে যাহাকে সম্পূর্ণ অভিনব বলা যাইতে পারে। 'বিষবৃক্ষে'র বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তথাপি, এই কয়টি কথা বলিতে হইল, তার কারণ, অধ্যাপক ব্র্যাডলির সংজ্ঞা অনুসারে উহা যে খাঁটি ট্র্যাজেডি—অন্ততঃ শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি হয় নাই, ইহা মানিতে হইবে; নায়ক নগেন্দ্রনাথের চরিত্র যে কত দুর্ব্বল তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ বাঁচিয়া গেল—মরিল কুন্দ; তথাপি নগেন্দ্র স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিল না। কিন্তু তাই বলিয়া 'বিষবৃক্ষে'র ট্র্যাজেডি যে ক্ষুণ্ন হইয়াছে তাহাও নহে। বরং ইহাই দেখি যে, ঐরূপ মৃত্যুই পুরুষের একমাত্র শোকাবহ পরিণাম নয়। বিষবৃক্ষ-উপন্যাসে—'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' এই বাক্যও যেমন আর একটা অর্থে সত্য হইয়াছে, তেমনই, দৈব ও ঘটনার দুশ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলও সেই ট্র্যাজেডিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আরও একটা বড় প্রভেদ আছে। এই ট্র্যাজেড়িতে পুরুষের পৌরুষ-মহিমার পরিবর্ত্তে নারীর প্রেমশক্তির গৌরব-ঘোষণা আছে। সেই শক্তির কাছে পুরুষের পরাজয় তাহার আত্মাভিমানের পক্ষে লজ্জাকর বটে, কিন্তু তাহার গভীরতর আত্মচেতনায় সেই প্রেমের

নিকটে পরাজয় স্বীকারই কি মর্ত্ত্যজীবনের নিঃশ্রেয়স নয়? উহাই সেই শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির নিরন্ধ্র অন্ধকারে একটু আলোকের আশ্বাস। এই নারী-প্রেমের অমৃত-রশ্মি শেক্সপীয়ারের নাটকেও আছে—সেখানেও কর্ডেলিয়া, ডেসডিমোনা আছে, কিন্তু পুরুষের দুরন্ত প্রবৃত্তির ঝটিকান্ধকার তাহাকে—হয় নির্ব্বাপিত, নয় ম্লান করিয়া দিয়াছে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির এক প্রান্তে এই যে একটি পাড় বুনিয়া দিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপক ব্র্যাডলি-কৃত সমালোচনা অপেক্ষা, সেই ট্র্যাজেডির অধিকতর মর্ম্মগ্রাহিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

(৪)

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির একটা পরিচয় শেষ করিলাম; এই বক্তৃতা উপলক্ষ্যে ইহার অধিক বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। ইহাতে কবি-বঙ্কিমের কাব্যকল্পনা ও কাব্যগুলির সাক্ষাৎ পরিচয়ের পরিবর্ত্তে আমি আমারই বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছি; বঙ্কিমকে আমি যে সম্পূর্ণ ও অভ্রান্তভাবে বুঝিয়াছি, এমন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমি জানি, আমার এই সমালোচনা শাস্ত্রমত সম্পূর্ণ হইল না—উপন্যাসগুলির গঠন, তাহাদের নির্ম্মাণ-কৌশল, বঙ্কিমী উপন্যাসের কয়েকটি বিশেষ ভাবগ্রন্থি প্রভৃতি অনেক কিছুই আলোচিত হইল না। কিন্তু যাঁহারা এই বক্তৃতাগুলি ধৈর্য্য-সহকারে শুনিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমি একটি বিশেষ দিক হইতে এই আলোচনা করিয়াছি—কবি-মানসের দিক। আশা করি, সেই দিকটির আলোচনা এই বক্তৃতাগুলিতে আমি সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছি। এখানে এই পর্য্যন্ত করিলাম। অপর দিকগুলি—যদি ইতিমধ্যে মেয়াদ না ফুরায়—একখানি গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে; উপস্থিত ইহাই আপনাদের নিকটে আমার কৈফিয়ৎ। সর্ব্বশেষে সাধারণভাবে কবি-বঙ্কিম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ট্র্যাজেডির কাব্যরস যেমনই হউক, তাহাতেও সেই চিরন্তন সত্যই সকল বহিরাবরণ ভেদ করিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে—পুরুষ-আত্মার জয় বা পরাজয় কোনটাই জীবনের শেষ কথা নয়; সেই সংগ্রামও সত্য নয়, সকলই শেষ পর্য্যন্ত একটা মায়া বা দুঃস্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটা বস্তু সেই মিথ্যা—সেই মায়াকে—জীবনের ঐ প্রহেলিকাকেও অর্থপূর্ণ করিয়াছে—তাহা প্রেম; সেই প্রেমের বিকার বা বিমূঢ়তাই সকল ব্যর্থতার নিদান। এই বাণীই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে নিরাশা ও সংশয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া মেঘান্তরালচ্যুত সূর্য্যরশ্মির মত, নানা ছন্দে ও নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতএব, শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম্মের যে লক্ষণ একজন মনীষী-ইংরেজ-সমালোচক নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলির নামে তাহা দাবী করা অসঙ্গত হইবে না; যথা—

"The supreme artist is not he who reproduces the commonplace and the trivial, but he who gives bodily forms to the noblest capacities of man, to 'the thought which wanders through eternity', to the will which breaks the way through every obstacle to the love that triumphs over death."

(C. E. Vaughan : *Types of Tragic Drama*, pp. 9-10)

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার উপন্যাস-কাব্যে, শুধুই পুরুষ নয়—পুরুষ ও নারীর যুগ্মজীবনে ঐ প্রেমের দুরূহ তপস্যাকে, এবং তাহা হইতেই—'the thought that wanders through eternity'—সেই ভাববস্তুকে শরীরী করিয়া তুলিয়াছেন, অর্থাৎ, জীবনেরই জবানীতে, মানুষের দেহাধিষ্ঠিত প্রাণ-মনের সলিল-মরুৎ ও মৃত্তিকায় তাহার প্রতিমা গড়িয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার উপন্যাস রোমান্সও নয়, নভেলও নয়; তাহা উপন্যাসের আকারে শেক্সপীরীয় আদর্শের নাটক। আবার, তাঁহার ট্র্যাজেডি-কল্পনায়, নর-নারীর চরিত্রসৃষ্টিতে অন্তর্য্যামীর মত যে কবিদৃষ্টির পরিচয় আছে, সে দৃষ্টি একাধারে বস্তুভেদী ও তত্ত্বসন্ধানী। জীবনের সেই বাস্তবকেই—মানুষের পশুজীবনের

বাস্তবকে নয়—মহৎ জীবনের বাস্তবকে—এমন গভীর করিয়া দেখা, আমাদের সাহিত্যে শুধুই বিরল নয়, একরূপ অভাবনীয় বলিলেই হয়; তার কারণ, এ সাহিত্য গানের সাহিত্য—সর্ব্বত্র ভাবরস-বিগলিত; জীবন-জিজ্ঞাসা নয়, জীবন-বিস্মৃতিই ইহার পরমার্থ। এ জাতির পক্ষে জীবনের তরঙ্গমুখর খরস্রোতে ঝাঁপ দিয়া তাহার আদি-অন্ত-নিরূপণ নিতান্তই নিরর্থক। জ্যোৎস্নাকাশতলে নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে তরী-বাওয়া, বুক-জলে দাঁড়াইয়া জলকেলি করা, অথবা কূলে বসিয়া বৃন্দাবনী আবেশে বংশীবাদন—ইহার অধিক তাহার সহ্য হয় না; কীর্ত্তি নয়—কীর্ত্তনই তাহার প্রাণের আরাম। এহেন জাতির সাহিত্যিক প্রতিভা কেমন হওয়া স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়। বাংলার মাটিতে ঐ একটিমাত্র সাহিত্যিক দেওদার-বৃক্ষ জন্মিয়াছিল,—তাল আছে, তমালও আছে, কিন্তু পার্ব্বত্য মহীরুহ ঐ একটিই। ঐরূপ পুরুষ-প্রতিভা বাংলাসাহিত্যে আর উদয় হয় নাই—তাই বিমূঢ়তা স্বাভাবিক; কিন্তু সেই বিমূঢ়তাই যদি পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হয়, তবে তেমন পাণ্ডিত্যের সম্মানরক্ষার জন্য বঙ্কিম-প্রতিভাকে ছোট হইতেই হইবে, কারণ, সেই সকল পণ্ডিত উদ্বাহু হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উন্নত স্কন্ধের নাগাল পাইবে না।

এই বক্তৃতায় আমি উপন্যাসগুলির যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা নানা কারণে সুবিস্তারিত ও সুবিচারিত হইতে পারে নাই, তাহা বলিয়াছি; যে সকল তত্ত্বের উত্থাপন করিয়াছি তাহার পূর্ণতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল, এবং উপন্যাসগুলি হইতে তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ আরও অধিক উদ্ধৃত করিলে ভালো হইত; আরও অনেক ত্রুটি ইহাতে আছে। তথাপি আমি ঐ উপন্যাসগুলি হইতে যে-একটা জগৎ আপনাদের চিত্তে প্রতিভাত করিবার উদ্যম করিয়াছি, তাহার মত কিছু বাংলাসাহিত্যে আর কোথাও নাই—ইহা সাহিত্য-রসিক সজ্জনমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ঐ জগতে আমাদের চিত্ত একটা উচচভূমিতে বিচরণ করে, এবং জীবনের এমন এক রহস্য-গভীর এবং অ-পূর্ব্ব-অনুভূত, অথচ প্রাণ-মনের গূঢ়তম উৎকণ্ঠা-সঞ্চারী রূপের সম্মুখীন হয়, যাহার মত এ সাহিত্যে আর কোথাও নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ নাটকীয় কল্পনাকে আমি যে শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির সহিত তুলনা করিয়াছি, তাহা যদি কোন অংশে যথার্থ হইয়া

থাকে, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এতবড় মর্য্যাদা বাংলা-সাহিত্যে আর কোন কাব্য দাবী করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও শেক্সপীয়ারের নাটকে তারতম্য অল্প নহে, আমি তাহা বার বার স্বীকার করিয়াছি; তবু ঐ যে তুলনা সম্ভব হইয়াছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সমালোচনাও যে স্তরে উঠিতে পারে—সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া, জীবন ও কাব্যের মধ্যে যে ধরণের অন্তরঙ্গযোগ আবিষ্কার করা যায়,—এক কথায়, কাব্য-জিজ্ঞাসাকে যেরূপ জীবন-জিজ্ঞাসায় পরিণত করা যায়—সমালোচনার সেই অবকাশ বাংলায় ঐ বঙ্কিম-সাহিত্যেই আছে। আমি তাহারই একটু আভাস দিলাম।

উপসংহারে, একদা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির যে কাব্যপরিচয় আমি একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাই আপনাদিগকে শুনাইয়া এই আলোচনা শেষ করিব। কবিতাটি এই—

বঙ্কিমচন্দ্র

বাঁশী আর বাজিল না কতকাল অজয়ের কূলে!
কীর্ত্তনের সুরে শুধু ভরি' উঠে আকাশ বাতাস
বাঙ্গালার—সব গানে প্রেমেরি সে দীর্ঘ হাহাশ্বাস
নদীয়ার নদীপথে মর্ম্মরিল বঞ্জুল-মঞ্জুলে!
ত্যজিয়া তমালতল রাধা জ্বালে তুলসীর মূলে
প্রাণের আরতি-দীপ; আঁখির সে বিলোল বিলাস
ভুলিয়াছে—কাঁদে, আর হরিনাম জপে বারো মাস;
কল্পবৃক্ষে ফোটে প্রেম, ফোটে না সে মনের মুকুলে।
এমনি সে সারা বঙ্গ অঙ্গে পরি' হরিনামাবলী
বাদল-বসন্ত-নিশি গোঙাইল উদাসীন সুখে।
রাখালের বেণুরবে গোঠে-মাঠে কাননে-কান্তারে
ধ্বনিল যে মধু-গীতি, তাহারি সে সরস ঝঙ্কারে
ক্বচিৎ উন্মনা কেহ—ঘটে বারি উঠিল উছলি',
গাঁথিতে পূজার মালা কোন্ ব্যথা গুমরিল বুকে।

২

মুক্তবেণী জাহ্নবীর ক্রমে লুপ্ত হ'ল সরস্বতী
শাস্ত্র-বালুকার বাঁধে, মন্ত্রে-তন্ত্রে শুকাইল শেষে
প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া ; এমন মাটির দেশে
জীবনের ছাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মূরতি।
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি, আর আছে সতী—
দম্পতী নাহিক' কোথা। নারী শুধু সহচরী-বেশে
পতির চিতায় ওঠে বৈকুণ্ঠের সুদূর উদ্দেশে।
পুরুষ স্বামীই শুধু—নাহি তার প্রেমে অধোগতি।
সন্ধ্যা হ'লে শঙ্খ বাজে গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে,
ঘাট হ'তে ঘরে ফিরে' দীপ জ্বালে ত্বরায় বধূরা ;
একে একে উঠে আসে তারকারা আকাশের তীরে,
সমীরণ শ্বসে মৃদু, ফুলগন্ধে রজনী মধুরা।
নিদ্রার নিশীথ-স্বপ্নে জেগে ওঠে বিরহ-বিধুরা
জীয়াইতে মৃত-প্রেম, তনু তার বীজনিয়া ধীরে।

৩

এমনি কাটিল যুগ ; যুগান্তের নিশা-অবসানে
দখিনা-পবন সাথে ভাগীরথী বহিল উজান—
দুয়ারে দাঁড়াল সিন্ধু, তার সেই আকুল আহ্বান
স্বপনেরে ছিন্ন করি' কি বারতা বিতরিল প্রাণে।
উচ্ছ্বসি' উঠিল ঢেউ বাঁধা-ঘাটে সোপান-পাষাণে,
কূল সে অকূল হ'ল, পিপাসার নাহি পরিমাণ।
আকাশ আসিল নামি'—অন্তরীক্ষে কারা গায় গান।
দেবতা কহিল কথা চুপি চুপি মানুষের কানে।
স্বপনে ছিল না যাহা ধরা দিল তাই জাগরণে—
পুরুষের চোখে রূপ—হর-চক্ষে উমা-হৈমবতী।
সে নহে কিশোরী-বালা, শ্যাম-শোভা নবীনা ব্রততী—
নতমুখাবদনী রাধা যমুনায় গাগরি-ভরণে।

সে রূপের ধ্যান লাগি' যোগী করে শ্মশানে বসতি—
পান করে কালকূট মহাসুখে, ডরে না মরণে।

৪

সতত স্বাধ্যায়শীল আত্মভোলা গৃহী-ব্রহ্মচারী
পুঁথি হ'তে চোখ তুলি' একদা সে নিজ নারী-মুখে
নেহারি' কিসের ছায়া জলাঞ্জলি দিল সব সুখে,
ক্ষুধায় আকুল হ'ল—প্রাণ যার ছিল নিরাহারী।
গৃহ যার স্বর্গ ছিল সেও সাজে পথের ভিখারী—
নজিয়া শেফালী ফেলি' রাগরক্ত রূপের কিংশুকে,
মন্দারের মালা ছিঁড়ি আশীবিষ তুলি' নিল বুকে—
যত জ্বালা তত সুখ, তত ঝরে নয়নের বারি।
সর্ব্বত্যাগী বীর-যুবা আত্মজয়ে করি' প্রাণ পণ
সকল সাধনা তার বলি দিবে নারী-পদমূলে—
মৃত্যুর অনলে শেষে সেই দাহ করিল নির্ব্বাণ।
নিজেরি সে পত্নী, তবু আজ দূর দেবীর সমান।
কিছুতে দিবে না ধরা, পতি-প্রেম গিয়েছে সে ভুলে—
তারি লাগি' রাজা রাজ্য ঘুচাইল, সর্ব্বস্ব আপন।

৫

বাল্য-প্রণয়ের সুধা বিষ হ'ল নবীন যৌবনে।
সাঁতারি অগাধ জলে দোঁহে মিলি' করিল উপায়—
নির্ভয়ে ডুবিল যুবা, আর জন দেখে ভয় পায়;
পুরুষ মরিল, নারী ফিরে চলে পতির ভবনে।
শিবিরে নামিছে সন্ধ্যা—অন্ধকার মনে ও ভুবনে,
"কেন বা মরিবে, প্রিয়?" প্রণয়িনী কাতরে সুধায়;
হেনকালে কার ছায়া হেরি' বীর মুহু মূরছায়—
"মরিতেই হবে!" বলি' হানে কর ললাটে সঘনে।

এ নহে কবির ভ্রম—নহে চন্দ্র পথের পল্বলে,
অথবা সে মৃত্যুলোভী পতঙ্গের নব বহ্নিস্মৃতি;
যেই শক্তি নারীরূপা—বিধি-বিষ্ণু-হরের প্রসূতি—
সেই পুনঃ নিবসিল পুরুষের চিত্ত-শতদলে
জীবনেরি যজ্ঞে সে যে স্বাহা-মন্ত্রে প্রাণের আহুতি—
মরা-গাঙে ডাকে বান, মৃত্যু মাঝে অমৃত উথলে।

৬

আঁধার শ্রাবণ-রাতে কাঁদে কেবা আর্দ্র বায়ুশ্বাসে?—
ধূলায়-ধূসরস্তনী, প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী—পাগলিনী।
পতিরে করিতে সুখী অশ্রুহীনা কোন্ অভাগিনী—
নিমীলিত আঁখি, মুখ বিষ-নীল—সুখহাসি হাসে।
শারদীয়া জ্যোৎস্নারাতি, ভরা নদী, স্রোতে তরী ভাসে—
তারি 'পরে কাঁদে বীণ, স্বপ্নে তাই শোনে নিশীথিনী!
ভৈরবী-পালিতা যেই—কামে-প্রেমে সম-উদাসিনী—
কি স্নেহে, মশানে তার ভাগ্যহত স্বামীরে সম্ভাষে!

* * * *

মাঠ, বাট, গোষ্ঠ হ'তে এ বঙ্গের জীবন-জাহ্নবী
বহিল উজানে পুনঃ সুদুর্গম দূর হিমাচলে—
যেথায় তারকা-তলে দেওদার-নমেরু-অটবী
রতি-বিলাপের গাথা স্মরে আজও শিশিরের ছলে;
হর তবু হেরে যথা মুগ্ধনেত্রে গৌরী-মুখচ্ছবি—
বঙ্কিম-চন্দ্রের কলা ভালে তাঁর অনিমেষে জ্বলে!

———